কালরাত্রি খন্ডচিত্র

শওকত ওসমান

কালরাত্রি খণ্ডচিত্র

শওকত ওসমান

জগচ্চিত্র প্রকাশনী

প্রকাশিকা
হাসনা আলম
জগচ্চিত্র প্রকাশনী
১৫৭/৫৮ ইনার সার্কুলার রোড
ঢাকা—১৭

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬

বিপনন সর্বাধিকারী
মফিদুল হক
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
৫১ পুরানা পল্টন
ঢাকা-২

মুদ্রক ঃ মোতাহার হোসেন
প্যাপিরাস প্রেস
১৫৯, আরামবাগ ঢাকা—২

মূল্য ঃ ২৫·০০ টাকা

Kal-Ratri Khando-Chitra : A reportage by Shaukat Osman
Price : US $ 2·00 (Overseas)

উৎসর্গ

হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যদের
নৃশংসতার শীকার
বাঙলাদেশের
সকল ভাই বোনের
আত্মার উদ্দেশ্যে

পূর্বকথা

আতিয়া বাগ্‌মার। আমার এই স্নেহভাজনার নাম প্রথমেই মনে করতে হয়। কারণ, তার সাপ্তাহিক "বাঙলার জয়" পত্রিকার জন্য অনুরোধ রাখতে গিয়ে এই পুস্তকের সূচনা। এক সংখ্যার পরও অনুরোধ অব্যাহত রইল। তারই ফল ঃ কালরাত্রি খণ্ডচিত্র। তিন বছর পাণ্ডুলিপি আমার কাছে পড়ে ছিল। বই প্রকাশের তাগিদও এলো এবার আতিয়া বাগমারের কাছ থেকে। তার দোহার প্রিয় আজিজ বাগ্‌মার ঢাকা কলেজে আমার প্রিয় ছাত্র ছিল। দম্পতির আগ্রহে আমার গড়িমসি ভাব কেটে যায়।

এই সময় প্রকাশনার ভার গ্রহণ করে আর এক স্নেহভাজনা অনুজাপ্রতিম হাস্‌না আলম। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় তিন দশকের। চাণক্য বলে গেছেন, বিলাস-ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, শ্মশানে (কবরে) বন্ধুত্বের পরীক্ষা হয়। মাহবুব আলম (আমার ডাকে, 'জগবন্ধু') এবং হাস্‌না আলম আমাকে যে, কবর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে শেষ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হবেন—তা আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। কারণ, প্রথম তিনটিতে তারা পাশ করে গেছেন। ফুল-মার্ক। এক শ'য় এক শ'।

আমি বাগ্‌মার ও আলম দম্পতির সুদীর্ঘ জীবন এবং সুখময় দৈনন্দিনতা কামনা করি।

বইটি ১৯৭১ সনের পঁচিশে মার্চের রাত্রির খণ্ডচিত্র এবং অন্যান্য স্মৃতিচারণা।

আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতি। অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে আমার এই দীন প্রচেষ্টা।

প্যাপিরাস প্রেসের হেলাল উদ্দীন গত বছর পৃথিবী ছেড়ে গেছেন। উত্তরাধিকারী মোতাহার হোসেন প্রবহমান রেখে চলেছেন তাঁর ঐতিহ্য। কল্যাণময় হোক মোতাহার এবং প্যাপিরাসের সকল কর্মীদের ভবিষ্যৎ।

শ. ও

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা।

পঁচিশে মার্চ ১৯৭১। বেলা দশটা।

মধুর ক্যান্টিনে দুই ছাত্রে তুমুল তর্ক বেধেছিল। রেশ তখনও চালু।

‘জেনে রেখো শেখ মুজিব শেষ পর্যন্ত আপোষ করবে।’

‘তাহলে চারিদিকে জনতার যে ঢল নেমেছে তা বঙ্গবন্ধুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ওঁর নেতৃত্বের বিচারে তোমার আক্কেলের দৌড় বুঝা গেল।’

‘আরে মিয়া, বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের মানসিকতা আমারও জানা আছে। ওদের আস্ফালন সব মুখেই। কাল ২৪শে মার্চ আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রেসিডেন্টের এ্যাড্‌ভাইসারদের বৈঠক বসেছিল। আমি ভেতর থেকে খবর পেয়েছি। সব চাল মাৎ। আওয়ামী লীগের নেতারা টালবাহানা করছে।’

‘তুমি ভেতরের খবর জানো। আমি বাইরের খবর জানি। এবারকার সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম···।’

‘আ-রে রাখো, মিয়া। শেখ মুজিব নস্যি নিলে তোমাদের হাঁচি শুরু হয়। তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু তোমাদের হাঁচি আর বন্ধ হয় না। হ্যাচ্চো...হ্যাচ্চো···। এবারকার সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম···।’

‘যুক্তির ধার ত ধারো না। গলাবাজি দিয়ে তা পূর্ণ করো। তোমাদের সঙ্গে কথা বলা দায়। চোখের সামনেই দেখবে কী ঘটে।’

‘হ···বহুৎ দেখলাম। আর দ্যাহার সাধ নাই। মধ্যবিত্তের দৌড় আমার জানা আছে।’

‘তুমি কী ?’

‘ব্যক্তিগতভাবে ? মধ্যবিত্ত।’

‘তোমার নিজের বিচারটা ওইভাবেই করো নাকি ?’

কোণঠাসা তার্কিক হঠাৎ চুপ, জওয়াব তৈরী করছিল মনে মনে। কিন্তু ক্যান্টিনের ভেতর আরো বহুৎ ছাত্র হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে নানা গোলমাল বাধিয়ে তুললে। বিচিত্র ধারার শব্দ পাক খায় চারিদিকে। সকলেই আড্ডা-পিয়াসী। সঙ্গে তৃষ্ণা চায়ের। কাজেই ‘মধুদা, মধুদা’ রব বার বার এই শব্দের প্রান্তরে ঝলক দিয়ে এগোয়।

তার্কিক দু-জন তখনও রণে ভঙ্গ দেয় না। জোর চীৎকার শোনা যায়।

‘আড়াই শো কোটি টাকা পাকিস্তানী মিলিটারী বাজেট। পূর্ব পাকি-

স্তানের মত কলোনী (উপনিবেশ) না থাকলে রসদ কে যোগাবে ? আর তার জন্যে—।'

'তার জন্যে কী ?'

'মাথা ঠাণ্ডা করে শোনো। যদি কোন কাজের পেছনে নৈতিক সমর্থন না থাকে তাহলে ত আর এগিয়ে যাওয়া চলে না। তার জন্যে নানা ফাঁদ পাততে হয়। নৈতিক সমর্থন ছাড়া যে-কোন দুষ্কর্মের পরিণাম দ্রুত এগিয়ে যায়। ওই আড়াই শ' কোটি ও আরো শোষণের জন্যে তাই তেইশ বছর কতো নসীহত—উপদেশ না শুনলাম। 'সব মুসলমান ভাই ভাই'··· প্রাদেশিকতা ইসলামে না-জায়েজ। লক্ষ্য কর, পবিত্র ইসলামের নাম নিতেও ওদের মুখে বাধে না। বাহান্ন সনে ফতোয়া শোনোনি ? বাংলা ভাষা হিন্দু কাফেরের ভাষা...মতলব হাসিলে শয়তানও বাইবেল আওড়ায়। দুর্নীতি অনেক সময় নীতির আলখেল্লা ধারণ করে মানুষের চোখে ধুলো দিতে। কিন্তু তেইশ বছর কেটে গেছে। ধোঁকা দেওয়া এখন আর অত সহজ নয়। যদি তা হোত, বঙ্গবন্ধুর ডাকে এত মানুষ সাড়া দিত না।'

'কিন্তু মধ্যবিত্ত শেষ পর্যন্ত—।'

দ্বিতীয় জন বাক্য শেষ করতে পারে না। কারণ, আশেপাশে আরো শ্রোতা দাঁড়িয়ে গেছে। প্রায় সকলের হাতে চায়ের কাপ। সে লজ্জা পেয়ে যায়, বোধ হয়। অপর জন কিন্তু আরো কোপ চালিয়ে যায় জিভের সুখে।

'নৈতিক সমর্থন ছাড়া কোন কাজে কেউ এগোয় না। ইংরেজ রাজত্বের কথা ধরো। আমার আব্বা ত ইংরেজের গোলাম ছিলেন। তিনি বলতেন, দেশের স্বাধীনতাকামী কোন আন্দোলন ··সভাসমিতি হলেই ইংরেজ সরকার দোহাই মারত ল' এণ্ড অর্ডারের, আইন এবং শৃঙ্খলার। সমাজের মানসিক ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির জন্যে অবিশ্যি শান্তি-শৃঙ্খলা দরকার। কিন্তু সেই শান্তি শৃঙ্খলার ফল কারা ভোগ করবে, সে প্রশ্ন তুললেই তুমি দেশদ্রোহী। দেশের উন্নয়ন ও উন্নতির গতি-প্রকৃতির প্রশ্ন তুলতেই হয়। কারণ, কিসের জন্যে উন্নতি, কার জন্যে উন্নতি ? এই প্রশ্ন ছাড়া সব মানুষের সমর্থন মেলে না। বাংলাদেশ আমার দেশ। আমার নিজস্ব এক কাঠা জমিও নেই কোথাও মাথা গোঁজার জন্যে চাষের জন্যে। তবু বাংলাদেশ তুমি বলবে আমার দেশ ? এই গোঁজা মিল রক্ষা করতে হয়। তখনই আসে কবির ভাষায় 'ধর্মের আবরণে অধর্মের শাঠ্য দুতিয়ালী।' বর্তমানে আমাদের পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যাক।'

ক্যান্টিনের ভেতর তখন আরো খন্ড দলের নানা বহস এবং চীৎকারে সরগরম। তার্কিক দুজনে অস্বোয়াস্তি অনুভব করে। ক্যান্টিনের ভেতর পল্টন মাঠের পত্তন খুব শোভন নয়। দু-জনেই একই হলের অধিবাসী—

চায়ের দাম মিটিয়ে এক সঙ্গে তারা বেরিয়ে গেল। কিন্তু তর্কের প্রবাহ দুজনের সংলাপের গণ্ডীর ভেতর আটকে রইল।

ক্যান্টিনের মালিক মধুর এমন সব দৃশ্যের সঙ্গে পরিচয় নতুন নয়। মাঝে মাঝে তার চায়ের কাপ 'ফ্লাইং সসার' হয়ে গেছে। তাও তার মনে পড়ে বৈকি। কিন্তু সে কী সব তলিয়ে দেখে ? না। তার সময় কোথায় ? খরিদ্দারের বায়না মেটানোই তার ধর্ম। ছাত্র-বন্ধুদের বায়নক্কা শত রকমের। তেমন খবরদারীর জন্যেই যেন তার পৃথিবীতে আবির্ভাব। এই পৃথিবীর মত তার ক্যান্টিন। তার ভেতর নানা জীবন-চিত্র, নানা স্ববিরোধিতার সহ-অবস্থানের জায়গার অকুলান হয় না। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ইসলামী ছাত্রশিবির—আরো যতো ধরনের ছাত্র প্রতিষ্ঠান আছে সবাই ত এখানে এসে জোটে। তাদের হল্লা-বচসার হাউইয়ে আগুন দিতে পানী প্রয়োজন হয়—চায়ের পানী। ঈশ্বরের মতই মধু নির্বিকার সরবরাহকারী। মুসলিম লীগের দুর্দান্ত প্রতাপের নীচেও সে ছিল। জাত-পাত নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেনি। বাঙ্গালীদের মধ্যেই এমন স্ববিরোধের অবস্থান সম্ভব। পশ্চিম পাকিস্তানের কোথাও কোন শিখ মধুর মতো কোন প্রতিষ্ঠান দখল করে আছে, একটা নজীর কেউ দিতে পারবে না। তার কারণ, মাটির ঐতিহ্যে ইতিহাসের ধারায়। স্থানের সংকীর্ণতায় যেমন এক কামরার অধিবাসীদের ঠোকাঠুকি লাগে, মানসিক সংকীর্ণতার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। ঔদার্য অর্জন করতে হয় মানুষ ও পৃথিবীর হদিস-সমন্বয়ে। বাঙ্গালীর সেই ঐতিহ্য আছে বৈকি। তাই মধু মাটি আঁকড়ে ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে সে বে-মানান কিছু নয়। মুসলমানের মহররমের ঢোল বাজায় হিন্দু ঢুলী।

তবু নিজের অভ্যেসের বাইরে মধু সেদিন এক ছাত্রকে আনমনা জিজ্ঞেস করে বসেছিল, দাদা, আজ কিছু হবে না ত ?

ছাত্রের জবাব, 'কী হবে ?'

'গণ্ডগোল।'

'গণ্ডগোল ত চলছেই। শুয়োরের বাচ্চা টিক্কা খান পাকিস্তান থেকে রোজ সৈন্য আনছে। তবে যতই গণ্ডগোল হোক, তোমাকে কোন গণ্ডগোল ছুঁতে পারবে না।'

'কেন, দাদা ?'

'তুমি ছাড়া যুক্তি-তর্ক, গলার জোর হিম্মৎ যোগাবে কে ? সব; সব কিছুর গোড়ায় চা দরকার। আর এক কাপ কড়া চা দিতে বলো, মধুদা।'

ছাত্রটি রোগের লক্ষণ সম্পর্কে অবহিত ছিল, কিন্তু তার পরিণাম

কোন জটিলতার রাস্তা ধরে জানত না।

পঁচিশে মার্চ, ১৯৭১

সারাদিন শহরময় নানা জল্পনা-কল্পনা। ভবিষ্যৎ গোটা দেশ-কে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে? দু'-দিন পূর্বে স্বাধীনতা ঘোষিত। পেছনে সমর্থনের প্রবাহ জলীয় ছোঁয়াচ থেকে জোয়ারে পরিণত। ডাক দিলেই মানুষ হাতের কাছে যা পায় তুলে নিয়ে দৌড়ায়। লাঠি বাঁশের না কাঠের, কাজে লাগবে না লাগবে না—এসব প্রশ্ন সামনে রাখে না। ছাত্রেরা হালে ক'দিন থেকেই ডামী রাইফেল নিয়ে প্যারেড করছে। যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল। মোকাবিলার মোকাবিলা করার জন্যে আত্মার গহনে তরঙ্গ-কল্লোল উদ্বেলিত। এমন পরিবেশে কে-ই বা স্থির থাকতে পারে?

সূর্য অস্ত গিয়েছিল সেদিনও যথা নিয়মে।

নগরে পথ-দীপ জ্বলে, তবু অন্ধকার থমকে থাকে বহু জায়গায়। সরীসৃপেরা বেরিয়ে আসে রসদ সন্ধানে। আলো ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে তারা খোঁজে অন্ধকার, নিবিড় অন্ধকার। চলা-ফেরার সুবিধা হয়। শীকার সহজে ধরা পড়ে।

শব্দের ধারাও সন্ধ্যার পর বদলে যায়।

সারাদিন কতো না জায়গা ফুঁড়ে মন্দ্রিত হয়েছে ঃ জয় বাংলা। মাত্র দু'টি শব্দে দেশের সন্তানেরা তাদের বহু কালের হারানো ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু আর শ্লোগান কোনও দিক থেকে ভেসে আসে না। গায়কেরা যেন তবলার সুর বাঁধতে ব্যস্ত। তারই ঠুকঠাক শব্দ, কর্মতৎপরতার মূর্ছনা দিকে দিকে ভাসমান।

'ব্যারিকেড গড়ো।'

'খবর পাওয়া গেছে ওরা এ্যাটাক—(হামলা) করবে।'

'গড়ো ব্যারিকেড।'

'ইট পাটকেল, ভাঙা ড্রাম, পুরাতন লোহা-লক্কড়ের গাদা—যা পারো আনো। বয়ে আনো।'

'হাত লাগাও, এসো হাত লাগাও।' সম্মিলিত শ্রম যখন প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়ে, তখন সভ্যতার বনিয়াদ পত্তন হয়। আর সেই মেহনত যখন মানুষের বিরুদ্ধে খাড়া হয়, তখন সূত্রপাত ঘটে বর্বরতার। বর্বরদের মোকাবিলায় মানুষকে মাঝে মাঝে বর্বতার আশ্রয় নিতে হয়। আহ্, কী নিষ্ঠুর প্রয়োজন! এমন প্রয়োজনেই বদ্ধ-পরিকর ঢাকা নগরী যেন শেষ সংকেতের অপেক্ষায় ছিল। সেই উম্মাদনার হিসাব-নিকাশ

ছিল না। শত্রুর মারণ-ক্ষমতার পরিধি জরীপ করার সময় কোথায় ?

যাত্রা করো, যাত্রা করো, যাত্রীদল।

বন্দরের কাল সমাপ্ত।

রাত্রি ন'টার দিকে খবর পাওয়া গেল কুর্মিটোলা থেকে ট্যাঙ্ক বেরিয়ে আসছে। সাঁজোয়া বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় পজিসন নিতে ব্যস্ত। শহরে কতো রকম গাড়ীই ত চলে, রাস্তায় মাঝে মাঝে পার্ক করে। সাঁজোয়া গাড়ীগুলোর গতি প্রকৃতির মধ্যে আলাদা কোন মাহাত্ম্য ছিল না।

আরো দু'ঘন্টা পরে।

রাত্রি এগারোটা।

সাঁজোয়া গাড়ী আর স্থবির নয়। নড়াচড়া শুরু হয়েছিল। এই আগুনের আজ্‌দাহা সাপ শুধু ধ্বংস করে না, পোড়ায় না, মানুষের দীর্ঘশ্বাস, আর্তনাদের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। বিয়োগান্ত শত শত নাটকের প্রম্পটার—নেপথ্য ভাষক হয়ে এগিয়ে যায় জলাজাংগাল, জনপদের উপর দিয়ে বিংশ শতাব্দীর এই তৈমুর লং। পা কিন্তু এর খোঁড়া নয়।

হঠাৎ আকাশ চকিত হয়ে উঠল। শব্দের তাড়নায় গাছের ডালে বিশ্রাম-রত পাখীকূল। ভোরের সূচনা করল চিরাচরিত অভ্যাস। কিন্তু সময়ের চেতনা তারা হারিয়ে ফেলেছিল। পাখী ও জীবজন্তু জানত না কাল-রাত্রি শুরু হয়েছে।

কাঁপতে লাগল গোটা শহর।

যেদিকে তাকাও আগুনের হল্কা। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে দাউ-দাউ আগুন শুরু হয়েছে মর্টার-বর্ষণের ফলে। তার পূর্বে ফ্লোরিসিন বোমায় উজ্জল হয়ে উঠেছিল নগরের আকাশ।

ইউনিভার্সিটি এলাকা কী স্তব্ধ ?

না।

এই এলাকা থেকেই বাঙালী জাতীয়তাবাদের মশাল অনির্বাণ শিখার উৎস রূপে জ্বলে উঠেছিল। পাকিস্তানী শাসকরা তা জানত। অনুন্নত দেশের ছাত্রদের দুর্ভাগ্য বিদ্যা-অর্জন শুধু তাদের দৈনন্দিনতার মধ্যে পড়ে না। দেশের কথাও তাদের ভাবতে হয়। তাই দেশের সমস্যা সম্পর্কে তারা নীরব, নির্বিকার থাকতে অপারগ। ইউনিভার্সিটি এলাকা শাসকদের কাছে ছিল বোলতার চাক। বিশেষ এই চাকে আগুন লাগাও। পোড়াও এই হুলের আড়ৎ।

হানাদার সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল ফণা বিস্তার-মারফৎ। অগ্নিময় তাদের

ছোবল। ত্রাস-সঞ্চারে পাকিস্তানী সৈন্যরা ফায়ার করছিল কোন লক্ষ্যবস্তু ঠিক না রেখে। মর্টারের শব্দ, মেশিনগানের টাক্-টাক…শল্‌শল্… আর্তনাদের মত মিনিটে মিনিটে প্রলয়ের সূচনারূপে গোটা এলাকায় আতঙ্কের চাঁদোয়া টেনে চলছিল। সলিমুল্লা হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল—এক কথায় অন্যান্য সকল হলের ছাত্র-ছাত্রীরা আরেক সবকের জন্যে তৈরী হচ্ছিল, যা তারা কোনদিন কল্পনা করেনি। ক্যারিকুলামে এই পাঠের জায়গা থাকে না।

পাকিস্তানী সৈন্যরা আর নৈপথ্যে শব্দের উৎস নয়। নানা হাতিয়ারে সজ্জিত তারা হলের ভিতরে ঢুকে পড়ল। সামনে ছাত্র পাও, ট্রিগার টেপো। আর কোন প্রশ্নের দরকার নেই। আর্তনাদ, গোঙানি, আর্ত চীৎকার—হোক তা মানুষের। তার কোন দাম দিও না। ঈমামের নির্দ্দেশ 'হাম জমিন দেখ্‌নে মাংতা, আদমী নেহি। আমি মাটি দেখতে চাই। মানুষ না।'

ইমাম ! ! ! !

আহ, ইমাম হোসেন, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম গাজ্জালী—কুল্ রহমতুল্‌লিল আলামিন—(সকলের উপর আল্লার করুণা বর্ষিত হউক) পুনর্বার আভিভূত হন আপনারা। আপনাদের নামের পূর্বে ইমাম শব্দ ছিল মানবতার পরকাষ্ঠার প্রতীক। আপনারা মানব-কল্যাণের প্রচেষ্টায় যে-কোন আত্মত্যাগে তৎপর ছিলেন। আর আজ নরাকার, নরাধম, জানোয়ারের আওলাদ, অকল্যাণের প্রতিমূর্তি ইমাম সেজে বসে এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রে—যার প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামী শাসন কায়েম করা—তারই কর্ণধার ব'নে যায়।

মুনাফেকির চরম নজীর পাওয়া গেল।

পঁচিশে মার্চের রাত্রে ইমাম নাম গ্রহণ করেছিলেন মিলিটারি গভর্ণর টিক্কা খান। সেই রাত্রের সমস্ত সংকেত-বাণী (কোড) আজ বাঙলাদেশের অনেকেরই জানা। বেতার মারফৎ যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন খান সাহেব।

কোড-নাম ইমাম।

ইমামের অনুরাগীরা বোধ হয়, ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ইউনিভার্সিটি এলাকায়। তাই বেদেরেগ নরহত্যার মাত্রা ঠিক রাখতে পারছিল না। অথবা, রাইফেলের নলের রসদ ফুরিয়ে আসছিল, তাই মিতব্যয়ী।

সলিমুল্লা হলের কয়েক জন ছাত্রের উপর তারা গুলি চালাল না। 'হ্যান্ডস্ আপ।'

ছাত্রেরা আত্মসমর্পণের কায়দায় উপরে হাত তুলে দাঁড়ায়। দোতলা

ও অন্যান্য কামরা থেকে জন এগারো ছাত্রকে তারা নীচে হলের উঠানে এনে আবার নির্দেশ দিলে, 'লাইন আপ।'

কাতারে দাঁড়াও।

কিন্তু তারা কাতারে দাঁড়াতে গেলে পাকিস্তানী জওয়ান বাধা দিলে, 'ঐসা নেহি।'

নতুন নির্দেশ। 'ফাইল ইন।' অর্থাৎ এক জনের পেছনে আর এক জন দাঁড়াও।

সেখানেও বাধা পড়ল। ফাঁক-ফাঁক দাঁড়ানো চলবে না। বরং ঘেঁষা-ঘেঁষি, পাশাপাশি।

দাঁড়িয়ে পড়ল যথারীতি এগারো জন ছাত্র। পাকিস্তানী সৈন্য তখন চীৎকার দিয়ে বললে, 'শোনো বাঙালী কা বাচ্চালোগ। আওর আভি দেখো (বাঙালীর বাচ্চারা শোনো এবং এবার দ্যাখো।')

কী দেখবে তারা ? এগারো জনের মনে এই প্রশ্ন চকিতে উঁকি মেরেছিল বৈকি।

হাঁক-ফুকার জওয়ানটা চীৎকার দিয়ে উঠল 'আওর দেখো পাঞ্জাবী গোলীকা তেজ ক্যাসা। (এখন পাঞ্জাবী গুলির কী তেজ দ্যাখো। দ্যাখো এক গুলিতে ক'টা পাখী পড়ে) দেখো এক গোলি মে কেৎনা চিড়িয়া গিরতা।'

একদম পেছনের ছাত্রের পিঠের কাছে রাইফেলের নল নিয়ে গিয়ে এক সিপাই ট্রিগারে টিপ দিলে। ছাত্রদের একজনও আর খাড়া রইল না।

সন্ধ্যার পূর্বে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের জওয়ানেরা গুজব শুনেছিল রাত্রে তাদের উপর মিলিটারীরা হামলা চালাবে।

তেইশে মার্চ বাঙলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। এই তারিখও এদেশের অধিবাসীদের কাছে স্মরণীয় দিন। পূর্ব-পাকিস্তানের মৃত্যু এবং বাঙলাদেশের জন্ম ত এক সূত্রে বাঁধা। এই ভূখণ্ড কোনদিন স্বাধীন ছিল না। মোগল-পাঠানেরা বিদেশী। তৎপূর্বে সেন-পাল রাজারাও ছিল বহিরাগত। ইংরাজের পরিচয় সকলের জানা। তারপর সর্বেসর্বা হয়ে বসল ইসলামের ঝাণ্ডার আবরণে মোড়া, নামে মুসলমান, আর এক শ্রেণীর শোষক—যাদের আর যা-ই বলা যাক, অন্ততঃ এদেশের মাটির সন্তান বলা চলে না। শেখ মুজিবের নেতৃত্ব আপামর জনসাধারণের নিকট সেই চেতনার সংবাদটুকু পোঁছে দিয়েছিল। তাঁর ''বঙ্গবন্ধু'' শিরোপা অমূলক কিছু নয়।

দাসত্বের শিকল ছেঁড়ার অনুরণন চতুর্দিকে।

রাজারবাগ পুলিশ লাইন নীরব রইল না।

পুলিশ নামে কতো বদনাম। সেই পুলিশ জান-কবুল শপথ নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারে অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য।

এই ধারণা ভুল।

পুলিশ ঘুষ খায় কেন? তারা সকলেই নিরপরাধ। যারা দেশ চালায়, জীবন-যাপনের ধারা সহজ করে, তারা এমন কোন ইন্সটিটিউশান গড়তে পারে না—যা পুলিশদের মহত্তর জীবনের মুখোমুখি পৌঁছে দেবে। পুলিশ এদেশের মাটির সন্তান নয় কী? তারা মানবতা-বোধহীন হয়ে যাবে পেশার খাতিরে—একথা ঝুট। যোগ্যতা, মনুষ্যত্ব, সেবা-প্রাণতা প্রভৃতি সদগুণের জায়গায়, যদি সম্পত্তি-সম্পদ দিয়ে মানুষের সামাজিক মর্যাদার বিচার হয়, সেখানে সকলেই টাকার দিকে দৌড় দেবে, অসংভাবে উপার্জনের পন্থা খুঁজবে। পুলিশ বাদ যাবে কেন? আসল অপরাধী তাই শাসকগোষ্ঠী, কোন ব্যক্তি-পুলিশ নয়। শাসক শ্রেণীর দায়িত্ব সম্পর্কে অনেকে সচেতন নন। তাই লোকে পুলিশের বদনাম দেয়।

ডাকের মত ডাক পুলিশের কাছেও পৌঁছায়। মসনদের মালিকেরা সে-দায়িত্ব এড়িয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধু মুজিবের উদাত্ত আহ্বানে রাজারবাগ পুলিশ-লাইন নীরব ছিল না।

রাত্রি ন'টার দিকে সারা পুলিশ লাইনে চাঞ্চল্য বেড়ে গেল। হোক পুরাতন মডেলের রাইফেল, তবু সকলের হাতে অস্ত্র ছিল। শত্রুর মোকাবিলা করতে পজিশন নিতে হয়। পুলিশেরা আশপাশের বাড়ী-ঘরদোর আগেই জরিপ করে নিয়েছিল। তাই দেখা গেল, রাত্রি দশটার দিকে তারা কয়েকটা বাড়ীতে পজিশন নিতে লাগল। পুলিশ লাইনের দক্ষিণে শান্তিনগরের শেষ উত্তর সীমানা। এদিকে দোতলা বাড়ী যা পাওয়া যায়, তার ছাদে একজন দু'জন করে পুলিশ হাতিয়ার-সহ তৎপর পজিশন নিলে। উত্তর দিকে আউটার সার্কুলার রোড। সেখানে রাস্তার ধার বা নিকটস্থ বাড়ীর ছাদে দাঁও-মত অপেক্ষা করতে লাগল জওয়ানেরা। তেমনই সিদ্ধেশ্বরী এলাকায় প্রস্তুতি। কারণ, ক্যান্টনমেন্ট থেকে এই সার্কুলার রোড ধরেই মিলিটারীরা এগিয়ে আসতে পারে। সেদিক থেকেই চোটপাট শুরু হবে।

পুলিশ বনাম মিলিটারী? এমন যুদ্ধের কথা কেউ কোনদিন শোনেনি। কারণ, অস্ত্রের তুলনামূলক হিসেব-নিকেশ যুদ্ধ-প্রস্তুতির একটি লাজেমী বা বাধ্যতামূলক শর্ত। রাজারবাগের পুলিশ লাইনের

কোন ভাই সেদিন হিসেব-নিকাশে করেনি। করার প্রয়োজন কোথায়? যার-যা-শক্তি নিয়ে জালেমের মোকাবিলা করাই মনুষ্যত্বের প্রেরণার আসল উৎস। পুলিশ-ভা'য়েরা মোকাবেলায় বুক পেতে দিয়েছিলেন। সেখানে বেনের মত পাই-পয়সার হিসেবের কোন জায়গা ছিল না।

গোটা শহর থমথম করছে। অন্ধকার রাত্রি। তার আড়ালে বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেড রচনার উন্মাদনা কিশোর-তরুণ নয় শুধু, বয়স্ক জনদের পেয়ে বসেছিল। কোটি কোটি বুকে তখন প্রতিধ্বনি সমুদ্র গর্জনের ধারায় আছড়ে পড়ছিল—

"ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ
যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

গেরস্থ বাড়ী এখন পুলিশের ছোট ছাউনি। রাজারবাগ পুলিশ লাইন সেই রাত্রে আপন সীমানার মধ্যে আটক ছিল না। তার বিস্তৃতি আশে-পাশে চারিপাশে চারদিকে। দৃশ্যতঃ, অতটুকুই। আর অদৃশ্যভাবে বহু দূর তার সীমানা, কয়েক মাইলে তা সীমাবদ্ধ নয়।

গোটা বাংলাদেশের সজীব অংশ হয়ে পড়ে এইভাবে প্রতিটি খণ্ড খণ্ড জমি, যখন প্রাণতরঙ্গ সব ভিজিয়ে দিয়ে যায়।

অথচ কলঙ্কিত পুলিশের পেশা। সাধারণ ধারণা, পুলিশের গুলীতে জনতা প্রাণ হারায়। মনুষ্যত্বের আহবান কানে পেঁছলে, সেই পুলিশ প্রাণদানের জন্য প্রতিযোগী হয় পড়ে। জাতীয় জীবনের এই মুহূর্তে বহু মুর্খ মনে রাখে না। খামখা পেশার উপরে অপবাদ আরোপ করে।

মধ্যরাত্রি নয়, রাত্রি এগারটায় কিছু পরেই মিলিটারীরা এই এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আর্মার্ড কোর, বর্মাচ্ছাদিত বাহিনীর চোটপাট শুরু হয় পুলিশ লাইনের উত্তর-পশ্চিম কোণা সিদ্ধেশ্বরীর দিক থেকে। তাদের মর্টার এসে পড়ল পুলিশ লাইনের বিল্ডিংয়ের উপর। আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল আউটার সার্কুলার রোড বরাবর পুলিশ ছাউনির টিনের ঘরগুলো।

ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষিত হতে লাগল। ফ্লেমথ্রোয়ার (আগুন লাগানোর জন্যে ব্যবহৃত বোমা) কোথাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। সারি সারি টিনের ছাউনি জ্বলতে লাগল। লেলিহান শিখা আকাশ-মুখী। বল্টু-আঁটা করোগেটেড টিনের দল এখন আর স্বস্থানে থাকতে নারাজ। মাঝে মাঝে ফট্ ফট্ শব্দ ওঠে, সঙ্গে ঝন্‌ঝন রব। গুলীবর্ষণ অব্যাহত আছে। অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে পুলিশ জওয়ানেরা রাইফেল হাতে 'কভার'

নিতে ব্যস্ত। মর্টারের শেল বিল্ডিংয়ের দেওয়ালে নানা সাইজের গর্ত খুঁড়ে চলেছে। পুলিশ লাইনের উত্তর-পশ্চিম দিকে মসজিদ—আল্লাহর ঘর। কিন্তু আল্লার ঘরেরও তখন কোন রেহাই ছিল না। অত রাতে মসজিদে কোন মুসল্লী ছিলেন না। শূন্য মেঝে। তবু পাকিস্তানী সৈন্যরা গুলী ছুঁড়তে কসুর করেনি। মসজিদ-সংলগ্ন পুকুরেও বুদ্‌ বুদ্‌ উঠছিল গণনাতীত। ফাটা 'শেলে'র টুকরো কিছুই ত স্থিত থাকতে দেয় না। অন্ধকারে লড়ায়ের সব হদিস বুঝা মুশকিল। জ্বলন্ত টিনের ছাউনি ও বিল্ডিংয়ে আগুনের রেশ দেখে অনুমান করা যেত, লড়াই সমানে সমানে নয়। একদিকে, মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত অস্ত্রের কাঁটায় সজ্জিত পাকিস্তানী সজারু। অন্যদিকে দেশ-জননীর ইজ্জৎ-রক্ষায় বদ্ধপরিকর প্রায় হাতিয়ার-হীন একদল জওয়ান, হাতে বিশ বছর আগেকার পুরাতন মডেলের রাইফেল। তা কী কোন অস্ত্র? তবু শক্তির পরীক্ষা দিতে পুলিশ জওয়ানেরা কোন কসুর করেনি। ঈমানের বলে বলীয়ান তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দুশমনের ফায়ারিং ক্যাপাসিটি'র খোঁজের প্রয়োজন ছিল না সেই রাত্রে। মাঝে মাঝে অন্ধকারে গাছপালা, এই এলাকার ঘরবাড়ী—সব প্রেতের মত দাঁড়িয়ে থাকে। একটা শব্দ পর্যন্ত ওঠে না। তার মধ্যে হঠাৎ গুলীর শব্দ। কচিৎ দু'একটি মাত্র। আবার অকস্মাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে গুলীর আওয়াজ। এই শব্দের ফারাকেই লড়ায়ের দুই পক্ষের শক্তির আন্দাজ করা যেত। মাঝে মাঝে ধাবমান গাড়ীর শব্দও জানিয়ে দিত মিলিটারিদের গতিবিধি। অকস্মাৎ ফেন্যারিসিন বোমা ফেটে পড়ছিল। সেইটুকু যা আলোর রাজ্য। আবার অন্ধকার, বেবহা অন্ধকার। তারই আড়ালে আত্মগোপনকারী দুই পক্ষ। কিন্তু টিনের ছাউনির আগুন নেভে না।

পুলিশ লাইনের মর্টারে ঝাঁঝরা আসল দালানের আড়ালে বীর পুলিশ নওজওয়ানেরা ওৎ পেতে ছিল। অসমান মোকাবিলা, তারাও উপলব্ধি করেছিল বৈকি। সকলে ছায়ামূর্তি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ চলাফেরা করে। অসমান মোকাবিলা। এইভাবে আত্মহত্যা করা সমীচীন নয়। যুদ্ধের কৌশল আছে। তা লঙ্ঘন, অনর্থক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। প্রয়োজন মত 'রিট্রিট' বা পশ্চাৎপসরণ কোন ভীরু কাপুরুষতা নয়, বরং কৌশল—আবার যথাস্থানে দুশমনের মোকাবিলার জন্যে।

এক সময় পুলিশ লাইনের জওয়ানদের মধ্যে পরিস্থিতির পর্যালোচনা ঘটে। কিন্তু উৎসাহিত হওয়ার নেশা অত সহজে কাটে না। কিছু জন সম্মতি দেয়, কিছু অস্বীকৃতি। এক সময় তারও ফয়সালা হয়ে গেল। অবধারিত মৃত্যু, যদি মুখোমুখি মোকাবিলা হয়। কারণ শত্রুর হাতিয়ার

উন্নত। তবু এক দল পুলিশ জওয়ান রয়ে গেল, অন্যদের পশ্চাৎপসরণে সুযোগ দেওয়ার জন্যে।

পুলিশ নাকি স্বার্থপর ?

জাগ্রত বিবেকের সম্মুখে মানুষ মানুষ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাদের বিবেককে ঘুম পাড়ানোর ফন্দি অনেক। শোষক শ্রেণী যখন ধর্মের বুলি আওড়ায়, তার পেছনে মতলব ছাড়া আর কিছু থাকে না। চব্বিশ বছর ধরে পূর্বপাকিস্তানের অধিবাসীরা সেই ফন্দি-ফিকিরের সঙ্গে পরিচিত। পবিত্র ইসলামের এত অবমাননা আর কখনও তারা দেখেনি। পুলিশ লাইন সেদিন জাগ্রত বিবেক। স্বার্থের আঁচড় কোথাও কেউ দিতে বা তার অধিবাসীদের প্রতারণার জালে জড়াতে পারত না।

অন্ধকারে বিদায়-লগ্নে ফিসফিস কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছিল বৈকি।

ঃ আবার দেখা হবে, ভাই।

ঃ খোঁজ নিও, বিদায়।

ঃ জয় বাঙলা।

অন্তরের উত্তাপ অন্ধকারে পথ দেখায়। তখন ব্যক্তিগত সুখের বন্ধন ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। মানবতা-ভূখণ্ডের মুসাফির এক-একজন পুলিশ জওয়ান সেই রাত্রে। মানবিক নাটকের দৃশ্যের কোন বোধ ছিল না পাকিস্তানী সৈন্যদের। তাই রাজারবাগ পুলিশ লাইন তাদের কাছে হয়ে পড়েছিল রক্ত মাংস-অবয়বহীন কিছু।

ঢাকা শহরে আরো হাজার হাজার মানুষ ছিল। তাদের কারো চোখে তখন ঘুম ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে সরে যায় বেসামরিক মানুষ। হিজরত শুরু হয়েছিল বহু অলিগলির পথে। দানবের থাবা অন্ধকারে কখন কোন দিক থেকে হঠাৎ নখর-সহ চেপে বসে কেউ জানে না। তাই নিরাপত্তার খোঁজ।

কিন্তু চিরকাল যারা আকাশের তলায় বাস করে তারা কোথাও যেতে চায়নি। কোথায় বা তারা যাবে ? নিকটস্থ কোন দালানে আশ্রয় ? কিন্তু দালানের উপর ত চোটপাট কম চলছে না। ইউনিভার্সিটি এলাকার খবর তারা আঁচ করেছিল। সুতরাং বস্তি নিরাপদ। জীবনের কাছে লাথি-পয়জার খেয়ে বাঁচা। পৃথিবীতে দুশ্‌মন আছে। প্রচণ্ড দুশ্‌মন আছে। প্রচণ্ড দুশ্‌মন তাদের কাছে একটি মাত্র ঃ ক্ষুধা। ভাগ্যাহত, নিরন্নের দল আদিম যুগের যাযাবরের মতই কোন স্থায়ী বাসের কথা ভাবে না। শহরের ফাঁকা জায়গা পেলে ঝুপড়ি বানিয়ে নাও। মাথা

খোঁজা প্রধান সমস্যা। ওইটুকু মিটে গেলে অন্যান্য জৈবিক তাগিদ কোন রকমে বুঝ দেওয়া যায়। পায়খানা-পেসাব ত হরদম লাগে না। তার জন্যে রাত্রির অন্ধকার আছে। আর দিনে একটা ব্যবস্থা হয়েই যায়।

ইউনিভার্সিটি এলাকার পাশেই রেল লাইন। তার আশেপাশে বস্তি গড়ে উঠেছিল। বাসিন্দারা গুলীগোলার আওয়াজে চকিত হয়ে পড়বে, বিচিত্র কিছু নয়। হামাগুড়ি দিয়ে সলাপরামর্শের জন্যে কয়েকজন কাম্‌লা-মজুর বেপরোয়া যুবক পল্লীর বর্ষীয়ানদের নিকট গিয়েছিল।

"আল্লা আল্লা করো, বাজান। বিহান হৈতে দাও।"

"কিন্তু চাচা, তোপের মুখে এ্যামন খামখা মরুম ক্যান ?"

"আরো আস্তে কথা কও বাজান। আমাগো কোন ভয় নাই। আমাদের মারব ক্যান ? আমরা কী কসুর করলাম ?"

ফিস্‌ফিস কণ্ঠেই সংলাপ। জবাব আসে, 'শেখ মুজিবের মিছিল যান নাই, জ্যাডা ?"

"গেছি তই হৈছে কী ? যহন জওয়ান ছিলাম জিন্না সাব্‌রে ভুট দিছি। অহন বুড়া। বছরের পর বছর গ্যালো, চাচা। প্যাডে ভাত জুড়ল না। দুই লায়েক পোলা চোখের সামনে মইরল। পয়সার অভাবে ব্যারামের দাওয়াই করার পারলাম না। জিন্না হালা ছিলো বিদেশী। দেহি আমাগো দ্যাশের পোলা মুজিব কী করে। গাঁ ছাড়লাম বহু দুঃখে বা-জান।"

হঠাৎ অন্ধকারে গুলীগোলা নয়, বস্তির মধ্যে দুই মেয়েলী কণ্ঠ স্তব্ধতার পর্দা ছিন্নভিন্ন করে দিল।

ঃ তর মুখ সামলা ছিনাল। মিলিটারী আইয়া তর এ্যার মদ্দি গুলী করলে তবে তুই থামবি।

সে কোলের কাছে মুঠি নিয়ে গিয়ে অশ্লীল ইংগিত করল।

ঃ চুপ হারামজাদী চাচা-ভাতারি, তর এ্যার ত্যাজে তুই আর বাঁচস না। অহন চুপ কর। আর রাও করিস না। ফজর হোক তর মামলা ডিস্‌মিস কইরা ছাড়মু।

ঃ খাড়া র' খান্‌কী। তর মিলিটারির লাং আইয়া পড়ুক।

তর বয়স কম, তরেই ধইরব।

এই বস্তির ভেতর দুই সতীনে কলহ নতুন নয়। সাজেদালি নামক এক মজুর দুই বিয়ে করে বসেছিল। কিছুদিন আগে সে মারা গেছে। কিন্তু দুই সতীনের বির্ষ, রিস, (হিংসা) আর যায় না।

ঃ চাচা, এই মাগী দু'ডারে বস্তিথন বার কইরা না দিলে আর শান্তি নাই। চুপ কইরা যাও। দু'ডাই পাগল। বোঝে না দুনিয়ায় কী অইতাছে। বা-জান, জলদি যাও।

দুই রমণীর চীৎকার হঠাৎ থেমে গেল। কিন্তু আর্তনাদ উঠছিল তখন রোকেয়া হল—মেয়েদের হোস্টেলে। খান উপাধিধারী পাকিস্তানী সৈন্যরা সেখানেও হামলা চালিয়েছে। এক এক কামরার মেয়েরা ভয়ে জড়সড়, পাঁচসাতজন পরস্পরের সান্নিধ্যে বুকের বল ফিরে পেয়ে স্তব্ধ বসে ছিল। হুড়মুড় করে একপাল সৈন্য ভেতরে ঢুকে পড়ল। তারপর টানাহেঁচড়া, ধ্বস্তাধ্বস্তি। "মা গো বাবা গো—" আর্তনাদ, কোথাও স্রেফ গোঙানি নৈশ রাত্রির পটভূমি ভেদ করে চলে যায়। কে তাদের ত্রাণ করবে? যারা দেশের রক্ষাকর্তা তারাই এখন নারীদেহে সীমান্ত খুঁজে পেয়েছে। এই ফ্রন্টিয়ার যেখানে প্রতিপক্ষের বাউন্ডারি তার নারীত্ব—সকল পুরুষেরও সেখানে জন্মের উৎসভূমি। কিন্তু তা-ই বলে হত্যা বন্ধ ছিল না। বেয়নেট চালানোর ফলে কিছু ছাত্রী পূর্বেই ধরাশায়ী। কিন্তু যুদ্ধ আর হাতাহাতি রইল না। শুরু হল মুখোমুখি। চিৎ-শায়িত কুমারী তরুণীদের উপর পশুত্বের কসরৎ শুরু করেছিল কয়েকজন পাকিস্তানী সিপাই। শেষ-চীৎকারের পর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেকে।

একটি কিশোরী বেড়াতে এসেছিল শহরে। আপা ছাত্রী। তারই সীটে কয়েকদিন থেকে শহর দেখে আবার মফস্বলে ফিরে যাওয়ার বাসনাযুক্ত আনন্দ-সফর। যৌবনের সীমান্তে পৌঁছতে আরো কয়েক সাল হয়ত দেরী ছিল তার। আচম্‌কা মসিবৎ এসে পড়বে কে জানত? কান্না-চীৎকারসহ সে আপাকে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু শক্ত হাতের থাবা উভয়কে বিচ্ছিন্ন করতে বেশী দেরী হয়নি। স্বাস্থ্যবতী সুগঠিত দেহ কিশোরী। যৌবনের মুকুল অতি সামান্য উঁকি দিতে শুরু করেছে। ক্ষুধার্ত পশু কী শিকারের সুবিধা-অসুবিধা দেখে, না বোঝে। এই কিশোরীর উপর পাঁচ-ছ'জন পাকিস্তানী পালাক্রমে ধর্ষণ শুরু করল। একবার মেয়েটি প্রাণপণ চীৎকার দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু আর্তের মিনতি, অসহায়ের বুক-ফাটা হাহাকারের সেই রাত্রে কোন দাম ছিল না।

মেয়েটি একদম স্তব্ধ।

পরিতৃপ্তি শেষে পাকিস্তানী সৈন্যটি শিকারের দেহ অবলোকনের জন্যে টর্চ জ্বালিয়েছিল।

শিকার মৃত।

কিশোরী দুই উরুর সংযোগস্থল থেকে ঝিলিক, ফিনিক দিয়ে উর্ধ্বমুখী রক্ত ছুটছিল।

তিরিশের বেশী হবে 'ইমাম' টিক্কা খানের এই পাকিস্তানী শিষ্য মুরিদের বয়স। শৈশবে সে জেনেছিল, তার জন্মভূমির নাম ঃ হিন্দুস্থান। কৈশোরে তা পাকিস্তান। কিন্তু সে ত আরও একস্থান থেকে

নির্গত। তাও জন্ম-ভূমি। বোধ হয়, সেই আদিম জন্মভূমি জিয়ারতের (দর্শন) খাহেস তার তখনও মেটেনি, তাই টর্চ জ্বালিয়েছিল।

ইসলামী রাষ্ট্র তৈরী হবে, এই ওয়াদায় জনসাধারণ পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেছিল। চব্বিশ বছরে তার ফল পাওয়া গেল। ইসলামী রাষ্ট্র তৈরী পাকিস্তানী সৈন্যদের নমুনা দেখুন। নিরীহ, নিরস্ত্রের উপর গুলী চালিয়ে তাদের ট্রিগারমুখী হাতের সুড়সুড়ি মেটায়। বয়সের বাছ-বিচার নেই, মা-বোনদের বেইজ্জত ক'রে তাদের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়। পবিত্র ইসলামের এমন অবমাননা কেউ কি কখনও দেখেছে বাবা আদমের কাল থেকে? ইসলাম-কে পাকিস্তানী রাষ্ট্রের শাসক ও চালকেরা মুখোসের মত ব্যবহার করেছিল। তাই কথা এবং কাজের মধ্যে এত ফারাক। ফন্দী ছাড়া মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না। ফিকির-বাজ পাকিস্তানী শোষকেরা মুনাফেক—মুসলমান নয়। তাদের ফন্দী-ফিকির ও মুনাফেকী (ভণ্ডামী) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্ব উলঙ্গ তুলে ধরেছিল পূর্বপাকিস্তানী অধিবাসীদের সম্মুখে। আজও নেশার ঘোর—দাসত্বের মৌতাত অনেকের মগজ থেকে দূর হয়নি। তাই দেখা যায় ধর্মের লেবাসধারী এক শ্রেণীর মানুষ। তারা শোষকদের ঢ্যাঁড়াদার, জয়ঢাক রূপে হাটে-বন্দরে, গঞ্জে, শহরে বিচরণ করে। পবিত্র কুরান শরীফে আছে ঃ "লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন" "তোমার ধর্ম তোমার জন্যে, আমার ধর্ম আমার জন্যে।" অথচ এই খেলকাধারী ধার্মিকেরা হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-বৌদ্ধ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা ওঠানোর জন্যে। রাজনীতির ক্ষেত্রে মূর্খ, ধর্মের ক্ষেত্রে ওরা মুনাফেক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাদের ভণ্ডামী ভেঙে দিয়েছিলেন। তাই স্বাধীনতার সংগ্রামে অত প্রচণ্ড প্রবল জোয়ারের প্লাবন জেগেছিল। চরম আত্মত্যাগ, সুখ-সম্পদ বিসর্জনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ তাই ত লক্ষ-কোটি মানুষ কাতার বেঁধেছিল শতাব্দীর জঞ্জাল, সামাজিক আবর্জনা চিরতরে দূরে নিক্ষেপ করতে।

এমন মুহূর্ত-ক্ষেত্রে কোন মূর্খ হিসাব-নিকাশে সময়ের অপচয় ঘটাবে?

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের টিনের চালগুলো সেদিন যেন গোটা শহরের মশাল নয় শুধু অনাগত মনুষ্য-সমাজের দিকদর্শী মশাল। সব পুলিশ কভার নিতে পারেনি। অনেকে জ্বলন্ত শেডের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

গোটা ঢাকা শহর প্রেতায়িত। তার রাস্তার সব আলো যেন কোন

দানবের ফুৎকারে নির্বাপিত। টার্গেট হওয়ার ভয়ে ঘরের আলো গেরস্থরা আর জ্বালিয়ে রাখেনি।

কিন্তু মাঝে মাঝে আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ফ্লোরিসিন বোমা হাউইয়ের মত উপরে উঠে যায়। সাথে কোথাও কোথাও আগুনে-বোমা ফেটে পড়ে।

কিছুক্ষণ পূর্বে বক্শী বাজারের রেল লাইনের পাশের বস্তীর ঝুপড়ি নীরব হয়ে গিয়েছিল। দুই সতীন আর ঝগড়া করে না। তবে জেগে ছিল প্রায় সকলে। শিশুরা হয়তো সারাদিনের ক্লান্তির জন্যে ঘুমে অচেতন। নচেৎ কেয়ামতের প্রতীক্ষার্থীরা কী কোথাও নিশ্চিত আরামের কোলে ঢলে পড়তে পারে ?
হঠাৎ বস্তীর উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি সাঁতার দিতে লাগল। সন্ত্রস্ত সব বাসিন্দারা। তারপর বস্তী এলাকা ঝলমলিয়ে উঠল। না, কোন আগুনে-বোমা নয়। জায়গার অবস্থান জানার জন্যে সৈনিকেরা ফ্লোরিসিন বোমা ফাটিয়েছিল মাত্র।

কিন্তু বেশীক্ষণ সময় গেল না, হঠাৎ চতুর্দিকে বুটের মচ্‌মচ শব্দ শোনা গেল। পাকিস্তানী সেনারা বস্তী ঘিরে ফেলেছিল।

বস্তীর অধিবাসীদের অপরাধ কি ? তারা বস্তির অধিবাসী, তা-ই ত বড় অপরাধ। তারা দীন, বঞ্চিত। অমানুষের মত জীবন যাপন করে। দোজখের আর এক সংস্করণ এই বসবাসের এলাকা। চব্বিশ বছরের ইসলামী রাষ্ট্র। তার নাগরিকদের স্থায়ী ঠিকানা পর্যন্ত নেই। যাযাবর জীবজন্তুদের সামিল-প্রায় তারা। নোংরা নর্দমার পাশে, আবর্জনার ভেতর বাস করে আল্লার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আশরাফুল মখ্‌লুকাত। এই নির্বিত্ত দীনহীনেরা কী এমন অপরাধ করে ? বস্তীর অধিবাসী হওয়াই অপরাধ। তারা দীন, বঞ্চিত। সুতরাং পাকিস্তানের নিকট ভয়ানক কসুর-কারী।

বঙ্গবন্ধু পূর্বপাকিস্তানের শোষণ-বঞ্চনার প্রতিবাদে আন্দোলন গড়েছিলেন। এমন প্রতিবাদই ত অন্যায়, অপরাধ। সেই প্রতিবাদের নিমিত্ত প্রত্যেক দীনহীন, সকল রকম শোষিত, বঞ্চিত জনেরা। সুতরাং অপরাধী।

এমন ক্ষেত্রে, কেউ কেউ ইন্‌সাফের দোহাই তুলতে পারেন।

ইন্‌সাফ ! ? ! ? ! ?

ইন্‌সাফ আজও প্রতাপশালী জবরদস্তের ইচ্ছা মাত্র। ইসলামের পবিত্র নামের আড়ালে ইন্‌সাফের অবমাননা আরো বেশী দেখা যায়। হালফিল দৃষ্টান্ত কী আপনারা ভুলে গেছেন ?

জেলের প্রত্যেকটি কয়েদী সরকারের আমানৎ। এই আমানত খেয়ানৎ করা সভ্য চোখে চরম বর্বরতা। আপনারা কী এই বাঙলাদেশের কেন্দ্রীয় জেলে প'চাত্তরের নভেম্বর মাসে নেতৃস্থানীয় চার ব্যক্তির হত্যা ভুলে গেছেন ? তখন যারা বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন, তারা ইসলামের পয়বন্দ, ঈমানদার অনুসারী। একজন ইসলামী চেতনার প্রবল বিকাশের জন্যে মাথায় টুপি দিতে নসীহৎ করেছিলেন। খবরের কাগজে টুপির ছবিও ছাপা হয়েছিল। তাই পূর্বে উল্লেখিত, ইসলামের পবিত্র নামের আড়ালে ইন্‌সাফের অবমাননা আরো বেশী হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিপালিত পাকিস্তানী সৈনিকরা বস্তী ঘিরে হাঁক দিয়ে উঠল, ‘কুই হ্যায় ?’

ছিল বৈকি তারা, কিন্তু এতক্ষণ মৃত। সাহসের উপর ভর দিয়ে কয়েকজন বৃদ্ধ হাত জোড় করে এসে দাঁড়িয়েছিল। মুখ দিয়ে কারো কথা সরেনি।

“শোনো। পাঁচ মিনিট কা আন্দার তোম সাব নেকাল যাও ইয়ে ঝুপড়ি সে। হাম লোগ আগ্ লাগা দেগা।” এক সৈনিক গম্ভীর উচ্চগ্রামে উচ্চারণ করল।

আগুন লাগিয়ে দেবে ?

কেন ? সে প্রশ্ন সেই রাত্রে কেউ উত্থাপন করেনি।

ত্রস্ত, আতঙ্কিত দীনহীনের দল। অস্তিত্বের সংগ্রামে কতো কম নিয়ে বাঁচা যায়—তারই প্রতিযোগিতা চলে ওদের মধ্যে। তবু পার্থিব কিছু ছাড়া বাঁচা দায়। তাই পছন্দের বাছবিচার নয়, কী ছাড়া আর চলে না তারই বিচার শুরু হয়ে যায়। সময় মাত্র পাঁচ মিনিট।

গুহা থেকে বেরিয়ে আসছে মানুষের দল। চারদিকে অন্ধকার। তাই সকলে ছায়ামূর্তি। কোথায় চলেছে তারা ? খাদ্যের অন্বেষণে আদিম যাযাবরেরা বেরিয়ে পড়ত লোকালয় ছেড়ে অন্য লোকালয়ের খোঁজে। এখানে অনিশ্চয়তা প্রধান দিশারী।

বাঁচার সামগ্রী যে-যা পারে হাতে মাথায় কাঁখে নিয়েছে, বহনসাধ্য সুবিধায়। মাটির ঘটি বাটী, কারো অতি-সাধের রক্তের বিনিময়ে কেনা এ্যালুমিনিয়ামের বদ্‌না, কাঁথা, ছেড়া বালিশ, কাপড়ের পুঁট্‌লি, পান্তাভাতের হাঁড়ি—এমনতর ক্ষুন্নিবৃত্তির কিছু সমিধ। দুই সতীনের কলহান্তিক হৃদ্যতা দেখার মত। দু'জনের কাপড় যা' ছিল, এক ভাঙা রং-চটা তোরঙ্গে বোঝাই, মাথায় নিয়েছে কম-বয়সী সতীন মেয়েটি। অথচ কিছুক্ষণ পূর্বেই একে অপরের খুন দেখতে চেয়েছিল। একই সমান বিপদের মুখে মানুষ বৈরিতা ভুলে যায়।

ওদের মতো আরো তিরিশ চল্লিশটি পরিবার—আবালবৃদ্ধবণিতার কাফেলা অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে। মাত্র দু'দিন পূর্বে প্রসূতি, একটি মেয়ের কোলে শিশু। কয়েক জনের হাতে হাঁস, মুরগী। তিন বছরের একটি ছেলে, তার মাথায় থালা। থালার উপর একটি মুরগীছানা বসে ছিল। যাযাবরের দল এক উপনিবেশ ছেড়ে আর এক উপনিবেশের খোঁজে অগ্রসর। অন্ধকারে নিঃশব্দ এই যাত্রা।

হঠাৎ চারিদিক আলোকিত হয়ে উঠল। সকলেই চকিত, পেছনে ফিরে তাকায়।

রেল লাইনের বস্তিগুলো দাউদাউ জ্বলতে লাগল।

কাফেলার মধ্যে একটি পাঁচ বছরের বালক চীৎকার দিয়ে উঠেছিল, "মা রে ম্মা, হালারা আমাগো ঘর জ্বালাইয়া দিল।"

পাশের একটি জওয়ান তার মুখ হাত চাপা দেয় সঙ্গে সঙ্গে। ভাষা আলাদা, তাও চল্‌তি মুখের ভাষা। ওই গালি পাকিস্তানী মিলিটারিদের বুঝার কথা নয়। তবু সতর্কতা।

অবোধ বালকের জন্ম আর এক বস্তির মধ্যে। গত তিন বছর তারা এখানে এসে জুটেছিল। জায়গার উপর মায়া বসে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই তার প্রতিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত।

অন্ধকারের আশ্রয় এখন বড় নিরাপদ। জ্বলুক বস্তি। ওদিক চেয়ে আর কোন লাভ নেই। বরং তার আলোয় মিলিটারিদের গুলি ছোঁড়ার 'বাই' আবার চেগে উঠতে পারে। বস্তির মানুষগুলো যেন কোন অধিকৃত জংগলের খেদানো জন্তু। তাই কাফেলা আর ঠিক রইল না। খণ্ড খণ্ড দল এক এক দিকে অন্ধকারে ছিট্‌কে পড়তে লাগল বক্‌সী বাজারের গলির ভেতর, আজিমপুরার দিক বা যেদিকে সুবিধা। নিরাপত্তার খোঁজই তখন সম্মুখে বড় প্রশ্ন। বস্তির ভেতর এক পঙ্গু বুড়ি ছিল। তার খোঁজ পড়েছিল অনেক বিলম্বে। আজীবন দুঃখের আগুনে যার আত্মা ভাজা হয়ে ছিল, তার অন্য ধরণের মৃত্যু অযৌক্তিক বৈকি। আগুনের কাছেই বৃদ্ধা তার দেহ বিসর্জন দিয়েছিল। মুসলমান মেয়ের কবর হোল না। সে জানত না, গরীবের ধর্ম নিয়ে বিলাস অশোভন।

ওই বস্তীবাসী যাযাবরদের মত ঢাকা শহরের মানুষ তখন নিরাপত্তার বুকে এতটুকু জায়গা পেতে হন্যে। যারা তক্তপোষে, খাটে শুয়ে ছিল, তারা মেঝের উপর নেমে পড়ল। জানালা দিয়ে গুলি আসতে পারে। যাদের কামরা চারিদিকে খোলা তারা হয়ত বাথরুম যা ঐ জাতীয় ঘুপ্‌চি

কোণ খুঁজছিল যেখানে দেওয়ালের পর দেওয়াল আছে।

গৃহবাসীদের এই দশা। কিন্তু পাকিস্তানের সুশাসনে সকলের মাথার উপর ত ছাদ থাকে না। এই ঢাকা শহরে হাজার হাজার মানুষ ফুট্‌পাথে খোলা বারান্দায়, আকাশের নীচে, উন্মুক্ত ময়দানে বিছানা পেতে নেয় রাত্রির বিশ্রামের জন্যে।

রমনার মাঠ বাদ যায়নি সেই রাত্রে। অনেকে গাছের তলায়, আকাশের নীচে শুয়ে ছিল। কিন্তু অন্ধকারে গুলিগোলার আওয়াজ যখন প্রচণ্ড বেড়ে চলল, তারা প্রমাদ গনল। খোঁজো নিরাপত্তার একটু ঠাঁই।

মাঠের বুকে রমনা কালীবাড়ী। ওই মন্দিরের দালানে জায়গা পাওয়া যাবে বৈকি। অনেক হা-ঘরে, ছিন্নমূল মানুষ তাই কালীবাড়ীর দিকে ছুটেছিল নিজেদের বিছানাপত্র বগলে।

সকলের মনে হয়ত এই ধারণা ছিল, যদিও হিন্দুর মন্দির, তবু ধর্মের মোকাম। পাকিস্তানের শিক্ষায় শিক্ষিত এবং যে-রাষ্ট্রের বুনিয়াদ ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত—তার সৈন্যরা মন্দিরের গায়ে হাত দেবে না।

নিরাপত্তা-সন্ধানীরা হিসাবে ভুল করেছিল। তারা জানত না আদৌ, পাকিস্তানের মদ্যপ, ঘুষখোর, রেণ্ডিবাজ শাসকবৃন্দ যারা প্রতিদিন "ইসলাম-ইসলাম" উচ্চারণ মারফৎ মুখে ফেনা তুলত, তারা সৈন্যদের মগজ ধোলাই করে এনেছিল এই বলে যে "পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানেরা আধা-হিন্দু, ওরা তাই পাকিস্তান চায় না……তাই শেখ মুজিবের ষড়যন্ত্রে ওরা এমন আন্দোলন, চীৎকার তুলেছে জোরশোর।" ঈমান যখন পকেট বা পুঁটুলির মধ্যে সেঁধোয়, তখন ধর্মের অবমাননা এইভাবে ঘটে। দেশরক্ষা বাবদ পাকিস্তানে বাজেট ছিল আড়াই শ' কোটি টাকা। তার পাঁচ শতাংশও পূর্ব-পাকিস্তানীদের হিস্যায় আসত না। শেখ মুজিবের অপরাধ ছিল এই হিস্যা দাবী এবং তদনুযায়ী শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন। "ছয় দফা" তারই ভূমিকা মাত্র। পাকিস্তানী রাষ্ট্রনায়কেরা পবিত্র ইসলামের আড়ালে থেকে তখন বন্দুক চালানোর সংকল্প গ্রহণ করল। কারণ, ঈমান ত পকেটে সীমাবদ্ধ। পরবর্তী কালেও ঈমান তথা ধর্মের অবমাননা আমরা কম দেখিনি।

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শাহ আজিজ আজীবন মুসলিম লীগার। তিনি ১৯৭১ সনে জাতিপুঞ্জে গিয়েছিলেন পাকিস্তানের ওকালত-নামা নিয়ে বাংলাদেশের জন্মের বিরোধিতা করতে। তিনি ঈমানদার মানুষ। দ্বিজাতি তত্বে বিশ্বাসী। ১৯৭১ সনে তার ক্রিয়াকলাপ খুব স্বাভাবিক। প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে তার নিজের বিশ্বাসের উপর আস্থাবান থাকার। এবং এমন কী ঈমানের জন্যে চরম

আত্মত্যাগের অধিকারও তার আছে। কিন্তু তিনি যখন বাঙলাদেশের জন্ম স্বীকার করে নেন রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের জন্য, তখন তাঁর ঈমানের বনিয়াদ সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলে পারা যায় না। আরো দেখা গেল, তিনি নিজ বিবেককে হয়ত চোখ ঠারেন। বাংলাদেশের বুকে তথাকথিত বাট-পঁয়ষট্টি 'জেনেভা ক্যাম্পে' চার লক্ষ অবাঙালী মুসলমান রিফিউজী ভাইবোন গত দশ বছর ধরে—তা আর যাই হোক সুস্থ মানুষের জীবন যাপন নয়—তাদের সমস্যা তিনি বুকে গেঁথে নিলেন না, নিজের ঈমানে অটল ব্যক্তি যা করতেন। ইতিহাসের ঘূর্ণী পাকের শীকার, অন্ধ নেতৃত্বের কোরবাণী—আমার চার লক্ষ এই অসহায় ভাইবোনেরা কেন কেউ বিহার, কেউ মাদ্রাজ, কেউ ইউপি, কেউ উড়িষ্যা—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এইখানে এসে জমায়েৎ হয়েছিল ? 'মুসলিম হোমল্যাণ্ডে' এর ডাক কী শাহ সাহেব, আপনি দেননি ? আপনি আজ ক্ষমতায় আসীন। বিশ্বের জনমত গড়ে তোলেন নি কেন, ওদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিতে ? আপনি নীরব কেন ? পাকিস্তানের বর্তমান স্বৈরশাহীর ঈমানের পরিচয় নিন প্রস্তাব দিয়ে। সেখানে এক নির্লজ সেনাপতি 'ইসলামী হুকুমত' প্রতিষ্ঠার, কসম কাটছে প্রতিদিন। ইতিহাসে কতো রকম শ্লেষ 'আয়রনি'র সাক্ষাৎ না ঘটে। ১৯৭৩ সনে ইহুদী, প্যালেস্টাইন-যুদ্ধে প্রবল চাপে তিরিশ বছর ধরে উদ্বাস্তু প্যালেস্টাইনের রিফিউজী মা বোন ভাইয়েরা যখন জর্ডানে ঢুকছিল নিতান্ত নিরুপায়, তখন জর্ডান সরকার তাদের প্রবেশ বন্ধ করতে আক্রমন চালায়। সেই সেনাবাহিনীর অন্যতম কম্যাণ্ডিং অফিসার ছিলেন জিয়াউল হক—বর্তমানে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। রিফিউজী মুসলমান ভাইবোনদের উপর যে গুলী চালায়, বিবেকবর্জিত এমন মানুষের মুখে যখন 'ইসলামী হুকুমতের' কথা উচ্চারিত হয়—তখন মনে হয়, আল্লার লানৎ (অভিশাপ) পড়েছে এই কওমের উপর—এবং আল্লার বাণীরই প্রতিধ্বনি মারফৎ বলা যায়, এরা "সুম্মুন বুকমুন"—বোবা, বধির—এদের কাছে জ্ঞান "লা ইয়ারাজিয়ুন"—ফিরে আসবে না।

দৃষ্টান্ত প্রচুর দেওয়া যায়। ঈমানের সঙ্গে বেঈমানী কিন্তু ইতিহাস ধরে ফেলে। সেখানে কেউ মাফ পায় না। দশ বৎসর পূর্বে রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র থেকে এক ভাষণ দিয়েছিলেন জনাব সবুর খান—মুসলিম লীগের, বোধ হয়, সব চেয়ে বর্ষীয়ান নেতা। তারিখ ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১। তিনি বললেন, "……ইন্দিরার গর্ভে রাশিয়ার ঔরসে এক জারজের জন্ম হয়েছে, তার নাম বাঙলাদেশ……।"

ঈমানদার মানুষরূপে তিনি কী ভাবে বাঙলাদেশকে স্বীকার করে

নিতে পারেন? তা করলে, তিনি হয়ে পড়েন বাঙলাদেশের সন্তান—পাকিস্তানের নন। কিন্তু বাঙলাদেশ ত জারজ—সার্টিফিকেট তিনিই দিয়েছিলেন। বর্তমানে তাঁর পরিচয় কী, এই মুরুব্বীর কাছ থেকে জানার ইচ্ছা হয়।

রমনা কালীবাড়ীর বুকে আশ্রয়সন্ধানীরা ভুল করেছিল। যারা নিজের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রাখে না বা অধার্মিক—তারা অপরের ধর্মের প্রতি সম্মান দেখাতে অক্ষম।

রমনা মাঠের উত্তর দিক থেকে প্রথম মর্টারের শেল এসে পড়ল কালীবাড়ীর উপর। তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি।

আর্ত নরনারীর অসহায় ব্যাকুলতা। সাক্ষী ছিল তারা স্বয়ং। অনেকের তেমন সৌভাগ্যও হয়নি। কারণ ধ্বসেপড়া দেওয়ালের মধ্যেই তারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

আল্লা, ঈশ্বর অসহায়ের আশ্রয়। মন্দিরের ভেতর আশ্রিতজনেরা হয়ত বাঁচার আশা কেউ পরিত্যাগ করেনি। বিপদ আসে। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তা চলে যায় আর পবিত্র মন্দিরের মধ্যে প্রবল পরাক্রম নর-ঘাতকও পাপাচারী অন্তরের সকল সমর্থন পায় না।

সেই রাত্রে তারা হিসাবে ভুল করেছিল।

মানৎ শুধতে এসেছিল গ্রাম থেকে একটি পরিবার। সঙ্গে গ্রামের দশ বারো জন লোক। শহর দেখার লোভ ছিল অনেকের। নচেৎ একটা মানৎ শোধের জন্যে অমন কাফেলা প্রয়োজন হয় না। মন্দিরের সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়, হোটেলের খরচ বাঁচে। তা গ্রাম্য পরিবারের জন্যে কম কথা নয়। কিন্তু তাদের ইহকালের হিসেব শেষ হয়ে আসছে, তারা জানত না। পরিবারের সাত জন মাত্র বেঁচে গিয়েছিল আশ্চর্যভাবে। ভাঙা দেওয়ালের স্তুপে ঢাকা পড়ে গেলেও তাদের শরীরে মারাত্মক তেমন আঘাত লাগেনি। তাদের মুখেই পরবর্তীকালে শোনা গিয়েছিল কালরাত্রির কাহিনী। পাকিস্তানী সৈন্যেরা দু'তিনটি মর্টার মেরে পরে বাইরে থেকে ভেতরে ঢোকে। তখন তাদের সামনে যা কিছু জীবন্ত চোখে পড়ে, তারই উপর গুলি চালায়। সেখানে বিরতি ছিল না। তারপর মর্টার মেরে মেরে সমস্ত কালী মন্দির মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। কতজন সেই রাত্রে মারা যায়, তার পূর্ণ হিসাব পাওয়া যায়নি। অনুমান দু'শ' জন হবে।

রমনার মাঠে কালীবাড়ীর মন্দির-চূড়া ছিল ল্যাণ্ডস্কেপের এক বিশেষ চিহ্ন। চারিদিকে সেগুন, জারুল, লিচু ও অন্যান্য গাছের বেষ্টনী। মাঝখানে ফাঁকা মাঠ। মাঠের মধ্যে এই মন্দির। তার আকাশমুখী ত্রিশূল-চূড়া যেন অনন্তের ইশারা। নীচে গাছপালার আচ্ছাদনে

মন্দিরের অবয়ব আর এক শোভা ধরে থাকত। বায়ুসেবী বৈকালিক বহু পথিকের ক্লান্ত চোখ এইখানে হঠাৎ বিশ্রাম পেতে বৈকি। নানা ঋতুর অঙ্গ ঘিরে এই এলাকার দৃশ্য পরিবর্তন ঘটত, শহরের অধিবাসীরা তা জানে। বর্ষার সন্ধ্যায় মেঘের চাঁদোয়া ঢাকা এই মাঠে ছায়ার স্তুপ সেজে মন্দিরের ভিটে শিল্পীর স্মৃতিচর পটে পরিণত হ'ত। পাকিস্তানী সৈন্যেরা তা জানত না। কিন্তু তাদের আক্রোশ ছিল অবাধ্য পূর্ব পাকিস্তানী প্রজাদের উপর। ইট পাথর গাছপালা তার মধ্যে আটক পড়ার কথা নয়। মন্দিরের উপর তাদের হন্যেমির ব্যাখ্যা কোথায় ? সভ্য মানুষের প্রতীকের সংখ্যা লাগে বহু। জাতীয় পতাকাও একটি বিশেষ মর্যাদা অধিকার করে রাখে। তাছাড়া নানা অসংখ্য ছোটখাট প্রতীক দরকার হয়। ভাষা, সংখ্যা প্রতীক ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু বর্বর মাত্র অল্প কয়েকটির মধ্যে বসবাস করে এবং তার নিজের ব্যবহৃত প্রতীকের বাইরে অন্য কোন প্রতীক দেখলে বিরূপ হয়। এবং এই বিরূপতা খুব সহজে অন্ধ পশু-প্রবৃত্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। পাকিস্তান সৃষ্টির উপায় হিসাবে বর্ণবিদ্বেষ ছিল একটি বিশেষ উপাদান। সামাজিক, আর্থ-রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক সব উপাদান প্রায় কানা হয়ে গিয়েছিল ওই উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাহনের নিকট। ঈশ্বরের ঘর—অর্থাৎ ধর্মের মন্দির যদি সৈন্যদের বর্বর করে তুলে, তা বিচিত্র কিছু নয় এই ক্ষেত্রে। আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছয় দফা আন্দোলন হিন্দুদের কারসাজি, প্রতিবেশী ভারতবর্ষের যোগসাজস উস্কানি—এমন প্রচারণার অন্ত ছিল না, মাসের পর মাস জুড়ে। সাধারণ পাকিস্তানী সৈন্যরা প্রচারণার খপ্পরে উন্মত্ত হয়ে উঠবে, তা অস্বাভাবিক কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

রমনা মাঠের এককোণে হাইকোর্টের চৌহদ্দি সংলগ্ন শেরে বাংলা ফজলুল হকের মাজার।

অনন্ত শয্যায় শায়িত জনের ঘুম কি এত আর্তনাদ, মারণাস্ত্রের বিকট শব্দে অটুট ছিল ? হয়ত এই রণতাণ্ডব দেখছিলেন তিনি। তিনিও কী আর্তনাদ করে ওঠেন নি ? হয়ত পরপারের অন্ধকারে অস্পষ্ট অশ্রুত তাঁর কণ্ঠস্বর চিরাচরিত জলদ মন্দ্রে ফেটে পড়ছিল, “বাঙলার মুসলমান, আমি প্রথমে পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলাম। আমার কথা তোমাদের কানে গেল না। তোমরা উম্মাদ হয়ে উঠলে। শেষে আমিই পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করলাম। নসীবের ফের। কোটি কোটি উম্মাদের সঙ্গে আমি আর কী ভাবে বাস করব ? তার একমাত্র উপায় ছিল উম্মাদের ভান করা নিজের মানসিক সুস্থতা রক্ষার জন্যে। তোমরা জানো, বেশী

দিন গেল না, আমি আবার জিন্না তথা পাকিস্তানের বিরোধিতা করলাম। উন্মাদের ভান বেশী দিন রক্ষা চলে না। প্রথম থেকেই আমার মনে খট্‌কা লেগেছিল। আজ প্রায়শ্চিত্ত করো। হিন্দু মুসলমান বর্ণবিদ্বেষ পুঁজি করে পাকিস্তান চেয়েছিলে, প্রায়শ্চিত্ত করো মুসলমান, প্রায়শ্চিত্ত করো।"

মধ্যযুগীয় অন্ধকার ক্রমশঃ গভীরতার আশ্রয় খুঁজছিল। বাংলার বাঘ নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। প্রায়শ্চিত্তের প্রবাহ অক্ষুণ্ন রইল।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা মাঝে মাঝে নীরবতার অতলে তলিয়ে যায়। মনে হয়, রণতাণ্ডব থেমে গেছে। পাকিস্তানী সৈন্যরা আবার স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের আস্বাদ ফিরে পেয়েছে। কিন্তু কান্না, আর্তনাদের ক্ষমতাও এক-এক সময় মজলুমের দেহে থাকে না, তখনকার স্তব্ধতা কী সত্যিই স্তব্ধতা ?

বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বেয়াড়া শিক্ষক ছিল। তাদের শায়েস্তা করা অবিশ্যি দরকার। শাসকদের নথিপত্রে তাদের নাম আগে থেকেই বাছাই করা ছিল। সব অধ্যাপকদের তারা হত্যা করেনি। ইতিহাসে তা-ই ঘটে। অধ্যাপক অর্থাৎ শিক্ষক। মানব-সমাজে অজ্ঞানতা দূর করা তাদের ব্রত। কিন্তু ক্রান্তিকালে এক ধরনের শিক্ষকতার পেশা-নামধারী আবর্জনা গজায় যাদের প্রধান কাজ, আমার এক প্রবীণ সাংবাদিক লেখক-বন্ধুর ভাষায়, মূর্খতার সম্প্রসারণ। শাসকগোষ্ঠীর এই দালালেরা অজ্ঞানতার অন্ধকারকে তখন আঁকড়ে ধরে। অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, পবিত্র পেশার সারথীগণ কি করে এমন জঘন্য হীনতার মধ্যে নিজেদের বিসর্জন দেন ? তার জবাব সহজ। জ্ঞান তথা সত্যের দিকে তখন তাদের আর দৃষ্টি থাকে না, মানুষের সুখ-দুঃখে তারা আর অংশীদার থাকে না। মানুষের লোকালয় ছেড়ে তারা তখন জ্ঞানের সাধনা করে যদি নিতান্তই করে। তাদের দৃষ্টি চলে যায় তখন হালুয়া-রুটির দিকে, ইহজাগতিক আরাম আয়েশের পানে। শিক্ষকতা তাদের খোলস। অথবা বলতে পারেন, শিক্ষকের, অধ্যাপকের মুখোস তারা পরিধান করে। আসলে তারা অন্ধকারের তপস্বী, মূর্খতার সুড়ং-বিহারী। শোষক জালেমের সঙ্গে এদের আত্মীয়তার বন্ধন সহজেই গড়ে ওঠে হালুয়া-রুটির লোভে। ভণ্ডামির নানা রূপ আছে। তা যে কোন পেশার লোকেই গ্রহণ করতে পারে, যদি কর্তব্যের বাইরে তার চোখ থাকে, স্রেফ নিজের স্বার্থের উপর, নিজের শ্রেণীর স্বার্থের উপর। শিক্ষকের পদ-মর্যাদার বিচার শুধু সেই মাপকাঠির দিকে চোখ না রাখলে, আপনি আমি যে কেউ বিভ্রান্ত

হব। রাত্রির অন্ধকারেই সরীসৃপেরা বিচরণ করে। পঁচিশে মার্চের দিনে নয়, রাত্রেই তাই তাদের হামলা শুরু হয়।

অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ-ঠাকুরতার দরজায় বুটের পদাঘাত। দরজা খুলে দিয়েছিলেন তিনি। সন্ত্রস্ত, শঙ্কিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু তিনি অধ্যাপক, আত্মসম্মান সম্পর্কে সদা সচেতন। এই জন্যে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে বেশী দিন থাকতে পারেননি। গ্রুপের সঙ্গে থাকা অধ্যাপকের পক্ষে কঠিন হয়। কারণ, চলমান বিশ্বে অহর্নিশ যে নব-নব মূল্যায়ন প্রয়োজন হয়, প্রাকটিক্যাল রাজনীতির মধ্যে অত ধৈর্য রাখার সময় কোথায়? সেদিক থেকে গুহঠাকুরতা রাজনীতির লোক ছিলেন না। স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও মেয়ে দোলা, পরিবারে তাঁরা তিন জন। সাংসারিক ঝামেলা কম। অধ্যাপক জ্ঞানচর্চার যে-সময় পেতেন তার সদ্ব্যবহার করতেন। পাকিস্তানে তিনি দ্বিতীয় না তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক এ নিয়েও তাঁর কোন মাথাব্যথা ছিল না। তিনি তেমনই হিন্দু ছিলেন, ছিলেন কবি নজরুল যেমন মা কালীর বন্দনা বা জগদ্ধাত্রী পূজার গান লিখেও মুসলমান—যদিও হেন কর্ম শরিয়তে "বেদাৎ" এবং শক্ত গুনাহ। নৃতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোকে ঠাকুরতা হিন্দু দেবদেবীর শ্রাদ্ধ করতেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে হিন্দুত্ব কোন পরাকাষ্ঠার পতাকা নয়। সৈনিকদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় তিনি নামের পূর্বে জন, লরেন্স বা রবার্ট যোগ করে দেশী খ্রীষ্টানরূপে আত্মপরিচয় দিতে পারতেন। হয়ত ফন্দীর পরিণামে, তাঁর প্রাণ বেঁচে যেত। কিন্তু মিথ্যের বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত জুলুমের সম্মুখে গুহঠাকুরতা ভুলে যাননি তিনি জ্ঞানের পূজারী অধ্যাপনার পেশায় প্রতিষ্ঠিত। সেই মুহূর্তে নিজের নাম এবং পেশার সার্থকতা রক্ষায় তিনি সত্যি জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিলেন। আত্মপরিচয়ের উপর তিনি কোন আবরণ দিলেন না, কোন আচ্ছাদন দিলেন না। তিনি পাকিস্তানের নাগরিক। অবিশ্যি। এবং ধর্মে হিন্দু। অবিশ্যি। নিরপরাধ জবাব। তবে নির্মম। তাই-প্রতি-জবাব দিয়েছিল হানাদার জওয়ান বন্দুকের ভাষায়।

দোলা-বাসন্তী দেবীর আর্তনাদে বেষ্টিত জ্যোতির্ময় লুটিয়ে পড়লেন।

অধ্যাপনা পেশার গায়ে বর্তমানে শতকুষ্ঠ রোগের দাগ। জ্যোতির্ময়ের ঝলক অজ্ঞানতার তিমিরান্ধ এই দেশে বহুকাল পথদর্শী তীব্র প্রভা, দৃষ্টান্তরূপে বিরাজ করবে।

গুহঠাকুরতা জানতেন না, মিথ্যে বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত সত্য স্রেফ মূল্যহীন ভস্ম মাত্র।

তাই কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে আত্ম-বিসর্জন দিয়েছিলেন ডক্টর গোবিন্দ দেব। দার্শনিক ক্ষেত্রে তিনি আইডিয়ালিষ্ট বা ভাববাদী। শোষক-শাসকদের নিকট এমন চিন্তার সমর্থন সর্বদা অগ্রগণ্য। গোবিন্দ দেব-কে তাদের হত্যার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বছরের পর বছর মধ্যযুগীয় বর্ণবিদ্বেষের লাভায় দেশবাসির আত্মা ভিজিয়ে রাখার পরিণাম এমনই ঘটে। সংস্কৃত নামধারী। অতএব পাকিস্তানের শত্রু। ডক্টর গোবিন্দ দেবের আর একটি অপরাধ ছিল। তিনি দয়ালু এবং বর্ণবিদ্বেষের উর্ধ্বে বিচরণ করেন। এক মুসলমান মেয়ে তার পালিতা কন্যা। নাম রোকেয়া। তিনি মোহাম্মদ আলি নামে এক ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দেন। জামাই ব্যাঙ্কে চাকরী করতেন। সংস্কৃত নামধারী, অতএব ধর্মবিরোধী। ডক্টর দেব ও তাঁর জামাইকে হানাদাররা রেহাই দিতে পারে না। হিন্দু মুসলমান আত্মীয়তার সূত্রে নয় শুধু, আবহমান কালের সূত্রে বাঁধা উভয়ের রক্ত সেদিন মিশে গিয়েছিল একই মেঝের সমতলে। পালক শ্বশুর ও জামাতার সুবাদ ত সেখানে তুচ্ছ কথা।

হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যরা মানবিক গুণ-সম্পন্ন, মাভৈঃ-স্বর অধ্যাপকদের খুঁজেছিল সেদিন ভার্সিটি পাড়ায়। তাই পরিসংখ্যান-বিদ অধ্যাপক মনিরুজ্জামানকে তাদের বড় প্রয়োজন ছিল। পরিসংখ্যান ষ্ট্যাটিস্‌টিকসের সঙ্গে রাজনীতি বা সত্যের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? এদেশে সমাজ-জীবনে এক আজব ব্যাপার ঘটে। ভণ্ড রাজনীতিবিদ এবং শোষকদের নিকট মানুষ হয়ে যায় সংখ্যা। তাদের হাড় মাংস রক্ত-ধমনী বাসনা কামনা আশা আহলাদ কিছুই থাকে না। কারণ, সংখ্যা প্রতীক মাত্র। সেখানে ওসব কিছু থাকা অবান্তর। কিন্তু অন্য দিকে ভণ্ডের দল সংখ্যার ধার কাছ দিয়ে যায় না। সেখানে মানুষের অস্তিত্ব বা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কথা ওঠে, সেখানে তারা চুপ করে যায় অথবা মন-গড়া কালপনিক সংখ্যা ব্যবহার করে। ডেমাগগি বা বাক-বোমাবাজির এক প্রশস্ত উপায়ঃ দেশের উন্নতি হচ্ছে, প্রতারকের ঘোষণা করে। কিন্তু কি উন্নতি হচ্ছে, তার-পরিমাণ কত, কার জন্যে উন্নতি হচ্ছে, কতজন তার সুবিধা পাচ্ছে, এসব সঠিক সংখ্যার কাছে তারা যায় না। যখন সংখ্যা প্রকাশ করে, তা হয় নিতান্ত মন গড়া অথবা ভুল তথ্যের ফলাফল।

সঠিক পরিসংখ্যানের সঙ্গে তাই সত্যের সম্পর্ক বড় নিবিড়।

নয় কোটি জনসংখ্যা। সেখানে যদি বার্ষিক বাজেট তিন হাজার ছ'

শ' কোটী হয়, তাহলে মাথাপিছু দাঁড়ায় বছরে চার শ' টাকা। অর্থাৎ মাসে মাথাপিছু পঁয়ত্রিশ টাকাও পড়ে না। তা দিয়ে কতটুকু উন্নতি হতে পারে দেশে, কল্পনা সাপেক্ষ। কিন্তু বক্তৃতার সময় পরিসংখ্যানের বক্তৃতা কোন ভণ্ড পলিটিসিয়ান শোনে না। পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ পূর্বাংশকে দশকের পর দশক শোষণ করে চলছিল। কিন্তু পরিসংখ্যান —সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যেত স্বতন্ত্র। আর শোষণের ছবি ঢাকা দেওয়ার জন্যে পাকিস্তানী শোষকেরা ব্যবহার করত তাদের পূর্বপাকিস্তানী এজেন্টদের। তারা প্রভুর কৃপাপুষ্ট ইসলামের পবিত্র দোহাই এবং অন্যান্য ফিকির প্রয়োগ করত। বুদ্ধিজীবী হতেন বুদ্ধির ব্যাপারী প্রভুর আড়ৎ ঠিক রাখতে।

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান রাজনীতি করতেন না। তিনি পরিসংখ্যানবিদ। কিন্তু সঠিক তথ্যের উপর গড়া পরিসংখ্যানের কাঠামো মিথ্যে কথা বলে না। তা সত্যের মতই নীরব নকীব। প্রফেসার মনিরুজ্জামান কিছু পরিসংখ্যান বের করেছিলেন একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়। একটি পোষ্টার অনেকে দেখে থাকবেন। তার শীর্ষে লেখা ছিল ঃ "সোনার বাংলা শ্মশান কেন" ? নীচে দুই পাকিস্তানী খণ্ডের তুলনামূলক সংখ্যা।

মনিরুজ্জামান রাজনীতি করতেন না সত্যি। কিন্তু সত্যের তাপস কতগুলো সংখ্যা জনসমক্ষে তুলে ধরেন। শয়তানের সংগে লড়া'য়ে সত্য অপরাধী হয়ে পড়ে। অধ্যাপক জামানের বেয়াদবী জালেম-শাহীর পক্ষে সহ্য করা ছিল নিতান্ত কঠিন।

পূর্বে উল্লেখিত প্রফেসর মনিরুজ্জামান সাহেব রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। সাধারণ চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তিনি পরহেজগার ব্যক্তি। নামাজ-রোজা নিয়মিত পালন করতেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তার আর কোন পরিচয় দেওয়ার কী প্রয়োজন আছে ? শিক্ষক মানুষ এবং পরহেজগার, তার প্রমাণ সেই কালরাত্রেও দিয়েছিলেন।

সমস্ত শহরে গুলিগোলার আওয়াজ, আগুনে-বোমার ঝলক রাত্রির কালো পর্দার উপর। কোথায় কি হচ্ছে জানার উপায় নেই। আর্তনাদের রেশ অধ্যাপকের কানে পেঁছায়নি—এমন ধারণা অসমীচীন। শহরে বালা-মসিবৎ নাজেল হয়েছে এবং ঘটনার সঠিক রূপ অনুমান নির্ভর। এমন ক্ষেত্রে একজন ধর্মবিশ্বাসী মানুষ কী করতে পারেন ? তিনি তার পরম আরাধ্যকে ডাকেন এবং যে-করুণাময়ের ইচ্ছাই সবকিছু, তারই কাছে আরজ করেন বিপদ-ত্রাণের জন্য। চরম মুহূর্তে, তিনিই

মুশকিল আসান করতে সক্ষম।

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান সেই রাত্রে জায়নামাজের উপর বসে কোরান তেলাওয়াতে মন দিলেন। পরিবারের অন্যান্য সকলে ত্রস্ত, শংকিত অধীর উৎকণ্ঠার ভেতর মুহূর্ত গণনা করছিল।

পবিত্র কোরানগ্রন্থ সম্মুখে। আল্লার বাণীর ভেতর অধ্যাপক জামান নিমগ্ন।

এদেশী মধ্যবিত্ত পরিবারের তুলনা এখনও কলাগাছ। একটির শিকড়ের আশপাশ দিয়ে আরো কলাগাছ থাকে বিভিন্ন সাইজের, বয়সের এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে নানা সম্পর্কে জড়িত। একজন উপার্জন করে, তার সংগে ভোক্তা অনেক। এই মানবিক সম্পর্ক এ দেশের ঐতিহ্য। য়ুরোপের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঘেরাটোপ থেকে আমরা আজও মুক্ত।

স্বাভাবিকভাবে অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের সঙ্গে আরো স্বজন ছিল। তা থেকে মানুষটির স্বরূপ পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় সমাজের অনুকারী এক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত ও বিত্তবান ব্যক্তিরা আত্মীয়স্বজনদের দূরে সরিয়ে রাখে, প্রধানতঃ, জীবন-যাত্রার মান নীচু হয়ে যাওয়ার আশংকায়। অধ্যাপক জামানের সঙ্গে থাকতেন তাঁর ছোট ভাই ব্যবহারজীবী শামসুজ্জমান, বোনের এক ছেলে, মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স। তাড়াছা তাঁর পরিবারের অন্যান্য জন থাকবে, তা হিসাবের মধ্যে ধরা নিষ্প্রয়োজন। পরিবারের বাইরের দু'জন অন্ততঃ ছিল। ওর বোনের ছেলে ছিল অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। অপরের দিকে টান, অপর মানুষের দিকে টান—এই মানসিক নীতিই মানুষ-কে তার নিজের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে মুক্তি দিতে পারে। সেখানে অন্যান্য সব জাগতিক ভেদ-রেখা মুছে যায়। যে-ব্যক্তি মানুষকে ভালবাসে সে আবার মানুষের ধর্মের খোলস দেখে না, তার গায়ের কী রঙ—কালা না ধলা—তা নিয়ে মাথা ঘামায় না; অপরের ধর্মের নিয়ম-কানুন, ক্রিয়াচারের তফাৎ দেখে আত্মশ্লাঘা বা ঘৃণা অনুভব করে না। স্বধর্মে অধিষ্ঠিত থেকেও সে বিশ্বের মানুষকে স্বজন রূপে গ্রহণ করে। সত্যিকার ধার্মিকের আর অন্য কোন পরিচয় নেই। কেবল পারিবারিক সংস্থান থেকেও অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের এক উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি বেরিয়ে আসে।

রাত তিনটে। জমান সাহেবের বাড়ীতে পাকিস্তানী হানাদাররা হামলা শুরু করল। প্রথমই দরজার উপর দমাদ্দম লাথি। তারপর আরো আঘাত। দরজা ভেঙে পাকিস্তানী সৈন্যরা ঘরে ঢুকল।

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান অবিচল বসে আছেন। সামনে কোরান শরীফ। তেলাওয়াত তিনি বন্ধ করেননি।

জায়নামাজের পবিত্রতা রক্ষা করবে, ইসলাম রক্ষার জন্যে যারা খুনী-জল্লাদ সেজেছে—তারা? শোষণের চাকা অব্যাহত রাখতে যাদের মোতায়েন করা হয়েছে, তারা আর যা-ই হোক মুসলমান নয়। আর যারা ওদের মোতায়েন করেছে, তারাও ধার্মিক মুসলমান নয়, যদিও ইসলামের নামাবলী তারা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রাখে এবং মুখে শাস্ত্রবাণী উচ্চারণ করে সভামঞ্চে প্রতিদিন।

মনিরুজ্জমান সাহেব-কে ওরা জায়নামাজ বুটের তলায় মাড়িয়ে, টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল।

একের অপরাধে অন্যের দণ্ড দিতে পারে শুধু বিবেক-বর্জিত, জ্ঞানহীন জীবজন্তু। ইসলামী রাষ্ট্রে পালিত সৈন্যদের আচরণ লক্ষ্য করুন। এক-আধ বছরের ব্যাপার নয়। চব্বিশ বছর ধরে ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তার আমিরুল মুমেনীন বা খলিফারা প্রতি পলে পলে পবিত্র ইসলাম ধর্মের দোহাই উচ্চারণের পর কী মহিমাময় সৈন্য তৈরী করেছে দেখুন! তাদের বন্দুকের নলের মুখে অপরাধী নিরপরাধীর প্রশ্ন অবান্তর, মানবিক মূল্যবোধের প্রশ্ন অর্থহীন।

কসাইয়ের দল হত্যা করল জমান সাহেবের চোদ্দ বছরের ভাগ্নে মঞ্জুকে। আকরামুজ্জমন, জমান সাহেবের নিজের সন্তান, বয়স মাত্র ষোলো। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। পাকিস্তানী সৈন্যরা দুই কিশোরকে গুলির চোটে ফেলে দিল নিঃশেষিত-প্রাণ। এই ভাবে তাদের অনুসরণ করে পরলোকে চলে গেলেন জমান সাহেবের আপন ভাই শামসুজ্জমান।

তবে পাকিস্তানী সৈন্যরা একদম পুরোপুরি শতে-শত জন্তু, তা বলা যায় না। শতকরা দশমিক এক-আধ মনুষ্য চেতনা সেই রাতে ওদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল। নচেৎ জমান সাহেবের এক মেয়ে ও দশ বছরের ছেলে মাসুদ কী ভাবে রেহাই পেয়ে গেল এই নারকীয় জীবনের যন্ত্রণার মুখোমুখি?

পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলাম বিলুপ্ত হতে চলেছে। তাই তারা পাকিস্তান-বিরোধী। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের এই অভিযোগের সুরাহা করার জন্যেই সৈন্য লেলিয়ে দেওয়া হয় সকল পূর্ব পাকিস্তানীদের ইসলামী সবক-দানে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় হানাদাররা ঢুকেছিল উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপকদের প্রফেসার-রূপে। বন্দুকের আওয়াজ সেই লেকচারের নারকীয় প্রতিধ্বনি।

প্রাণের বলি বন্ধ ছিল না। বাঙলাদেশের মাটির প্রতি ভালবাসা ছিল, তাই কী মৃত্তিকা-বিজ্ঞানের প্রফেসর ডক্টর ফজলুর রহমান নির্মমতার অমন শিকার হলেন?

প্রায় একই রেখায় আঁকা যায় হত্যার নক্শা।

অকস্মাৎ দস্যুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে বেদেরেগে গুলি চালানো। সেখানে টার্গেট বা লক্ষ্যবস্তু দেখার প্রয়োজন নেই।

অথবা, কোথাও কোথাও দু'একটি প্রশ্ন। অপরাধীকে সাফাই দেওয়ার সুযোগ কিন্তু তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। হত্যাকারীর খেয়ালই সর্বেসর্বা। শিকার যেখানে রেহাই পেয়েছে, তা-ও ওই খেয়ালের জের।

ঢাকা নিউ মার্কেট সেদিন সন্ধ্যা থেকেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সমাজের অস্বাভাবিক হাওয়া বোধ হয় জীবজন্তুর গায়েও লাগে। কুকুরের লম্বা একটানা ডাকে তখন শব্দ আলাদা হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ মনে করে, কুকুর কাঁদছে। হয়ত কান্না নয়, তবে অস্বাভাবিকতা সেখানে স্পষ্ট। বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের নিকট পূর্বাশংকা নানাভাবে ছায়া ফেলে। অশরীরী একটা প্রভাব তখন পণ্ডিত হোক মূর্খ হোক—সকলেই অনুভব করে। এমন কী দামাল তিন-চার বছরের শিশু পর্যন্ত চুপ করে যায়।

ঢাকা নিউ মার্কেটের ব্যবসাদারেরা দোকান-পাট বন্ধ করে চলে গিয়েছিল। কিন্তু শাক-সব্জীর ভেণ্ডার, কসাই বা এই জাতীয় অল্পপুঁজি বা রোজগারী কারবারীদের বাসাবাড়ী এই মার্কেটেই। অনেক ভেণ্ডার নিজের ষ্টলেই রাত্রে শুয়ে থাকে। সব মাল পাহারা দেওয়ার দায়িত্বও আছে। মাংসের দোকানে যারা চাকরী করে, তারা ষ্টলেরই ফাঁকে শুয়ে পড়ে রাত্রের ঘুম দিতে। এদেশী এই দৈনন্দিনতার সঙ্গে কমবেশী সকলের পরিচয় আছে। নিউমার্কেট গোস্তপট্টি রাস্তার ধারেই একটু ভেতর টেরে। এই সব ষ্টলের কর্মচারীরা সেদিন সকাল-সকাল শুয়ে পড়েছিল। শহরে উত্তেজনা আছে ঠিক। কিন্তু সকলে রাজনীতির সংগে প্রত্যেক্ষ জড়িত নয়। রাজনীতির হাওয়া অবিশ্যি সকলের গায়ে লাগে। তা অদৃশ্য বাষ্পের মত। অনেকে তার ছোঁয়া অনুভব করে। কিন্তু সকলের গায়ের চামড়ায় তার অভিঘাত সমান নয়। কেউ বুঁদ হয়, আবার কেউ বা উত্তেজিত। অনেকের কাছে তা কয়েক মুহূর্তের স্পর্শ মাত্র।

নিউ মার্কেটের মাংসের ষ্টলের কর্মচারীরা সকাল-সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ে। কারণ, আবার খুব ভোরেই উঠতে হয়। বাজার শুরু হয়ে যায় অন্ধকার থাকতে থাকতেই। চিরাচরিত তারা ঘুমে ঢলে পড়েছিল। রাত-দুপুরে গোলা-গুলির আওয়াজে অনেকের ঘুম ভাঙলেও আবার করোট

ফিরে শুয়েছিল। শহরে রাজনীতির উত্তেজনা তা বলতে গেলে মার্চ মাসের পয়লা থেকেই শুরু। যদিও গুলিগোলার আওয়াজ নিকটে ষ্টলের অধিবাসীরা তার কোন আমল দেয়নি। তাছাড়া মেহনতি মানুষের কাছে ঘুমের একটা বিশেষ মূল্য আছে। ওদের স্লিপিং পীল, ঘুমের বড়ি খেতে হয় না। দেহ-যন্ত্র সারাদিন এমন চালু থাকে যে ঘুমের ওৎ-পাতা দেখার মত। বিছানার মধ্যেই গভীর বিশ্রাম লুকিয়ে থাকে।

নিউ মার্কেটের নিকটেই ইউনিভার্সিটি এলাকা। গোটা শহর আলোড়িত। মাংসের ষ্টলের কর্মচারীরা তারই মধ্যে ঘুমোয় কী করে? অতি পরিশ্রম যারা করে না তাদের পক্ষে এমন পরিস্থিতি কল্পনা প্রায় অসম্ভব।

তারা ঘুমিয়ে ছিল।

মাংসের ষ্টলে সাজশয্যা আর কী থাকতে পারে? অনেকে তেলচিটে দাগ-ধরা বালিশের মালিক। অনেকের তা-ও নেই। ইটের উপর কিছু ছেঁড়া কাঁথার সামান্য টুকরো বিছিয়ে নিলেই চলে যায়। বালিশ ছাড়া, শুধু বাহু-বালিশেও বহুজন নিশ্চিন্ত ঘুমায়। এই আর এক আলাদা জগৎ।

দুপুর রাত্রে মীরপুর রোড ধরে হঠাৎ হঠাৎ মিলিটারী জীপ শাঁ শাঁ-শব্দে বেরিয়ে যায়। কখনও এসে নিউ মার্কেটের সামনে থামে। আবার ষ্টার্টের শব্দ। প্রেতায়িত আবহাওয়া।

তারা নির্বিবাদ ঘুমে অথবা অর্ধচেতন স্বপ্নাচ্ছন্ন জগতের মধ্যে শব্দ শুনেছিল মাত্র। আর কিছু না। কী ঘটছে, তার দায়িত্ব জাগ্রত মানুষের জন্যে।

শুয়ে ছিল তারা সারি সারি। ষ্টলের পর ষ্টল শায়িত মানুষের এমন প্রলম্ব মিছিল। অনেকের মনে হয়ত সেই ধারণা ধাক্কা দিয়ে গিয়েছিল যে দীন-দরিদ্রদের কেন-ই বা কেউ অনিষ্ট করবে—যারা রাজনীতি করে, তাদের যা হয় হতে পারে।

হঠাৎ কয়েকটা জীপ এসে থামল ঢাকা কলেজের সামনে। নিউ মার্কেট প্রায় ঢাকা কলেজের সম্প্রসারণ। এক অধ্যাপক রসিকতা করে বলতেন, "কোনটা কার সম্প্রসারণ ধরা কঠিন। এক দিকে ইলেম বিক্রী হয়, অন্য দিকে মাল। আসল উৎপত্তি কোন দিকে—সেটাই আবিষ্কার বা গবেষণার বিষয়।"

জীপ থেকে এক দল জওয়ান নামল। হাতে ষ্টেনগান। টর্চের আলো ফেলে তারা একবার দেখে নিল। তারপর ব্রাশ ফায়ার। ট্র-ট্র-ট্‌- শ্‌ শ্‌ শ্‌ শ্‌……..।

আগ্নেয়-অস্ত্রের শব্দ হেঁকে গেল; "হে ঢাকা শহরের খরিদ্দারগণ,

এসো বাজারে এসো কাল সকালে। নতুন মাল আমদানী হয়েছে। এমন সুযোগ আর কোন দেশে কোন কালে পাওয়া যাবে না। সুযোগ হারিও না। সারাজীবন আফ্‌শোস করে মরবে। অপূর্ব এই মালের স্বাদ। পৃথিবীর আর কোথাও তৈরী হয় না। মেড ইন পাকিস্তান। শুধু পাকিস্তানে নির্মিত হয়, আর কোথাও না। পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র। এসো, কাল সকালে এসো। বড় থলি নিয়ে এসো। এখানে বিক্রী হবে খুব ভোর থেকেই মানুষের গোস্তের সঙ্গে মেশানো গরুর গোস্ত, খাসীর গোস্ত। অপূর্ব তার স্বাদ। অপূর্ব এই পাঞ্চ বা মিশ্রণ। আদম-গোস্ত-গাওয়া-গোস্ত প্রসেস্‌ড ইন ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তান…।

নিরস্ত, নিরীহ জনের উপর অতর্কিত হামলা, এমন-কী যারা ঘুমিয়ে আছে, তারা যেন রেহাই না পায়—এমন পরিকল্পনার উৎস কোথায় ? সাধারণতঃ যুদ্ধের স্বাভাবিক নিয়মে অনর্থক গোলা-বারুদ খরচ করা হয় না। কিন্তু পাকিস্তানী হামলাদাররা তা ধর্তব্যের মধ্যে রাখেনি। তার ব্যাখ্যা অন্যস্থলে। পূর্ব পাকিস্তনের জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্কের বন্যা বইয়ে দেওয়াই ছিল হানাদারদের অন্যতম কৌশল। কিন্তু শুধু ঢাকা শহরের উপর এমন চোটপাট কেন ? প্রদেশের রাজধানী হয়ে উঠেছিল সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল। নেতৃত্বের আহ্বান এই প্রাণভূমি থেকেই উৎসারিত হয়। তাছাড়া, তখন বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান হয়ে পড়েছিলেন সেই প্রাণভূমির মূল সঞ্চালক হৃৎপিন্ড। তাঁর সুদীর্ঘ আটাশ বছরের রাজনৈতিক জীবনের শিরা-উপশিরা, রক্তবাহী ধমনী মার্চ মাসেই যেন অঙ্গাঙ্গী অর্গ্যানিক এক রূপ পেয়েছিল। তাঁর বজ্রকণ্ঠস্বর গায়েবী আওয়াজের মত কোটি কোটি মানুষের প্রাণে হিল্লোল তুলত। এই অদৃশ্য বায়ু-তরঙ্গের উৎসও ঢাকা নগরী। অতএব গোড়ায় আঘাত হানো। তার সেই আঘাত এমন হোক যেন পূর্ব পাকিস্তানের অবাধ্য প্রজারা দিশাহারা হয়ে যায়। অতর্কিত নির্বিচার হত্যা, লুট্‌, অগ্নিদাহ, মানুষের মনে খুব সহজে ত্রাস সঞ্চার করে। পাকিস্তানী সৈনদের পরিচালক কর্তৃপক্ষ সেদিক থেকে ভুল করেনি। তারা বাছ-বিচার-হীন ছিল। বাঙলাদেশের জন্মলগ্ন তাই ত্বরান্বিত হয়। বিবেচক, যুক্তি-পরায়ণ শত্রু আদৌ কাম্য নয় জংগের ময়দানে।

পাকিস্তানীদের ত্রাস-সঞ্চারের কৌশলে তাই ব'লে ব্যক্তি বাদ যায়নি। শুধু অধ্যাপক নয়, বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে বাঙালী জাতীয়তাবাদের অঙ্কুর যেখানে লালন-পালন করা হয়, এমন উদ্যান-রক্ষকদের সৈন্যরা

লিষ্ট-ভূক্ত করেছিল। আওয়ামী লীগের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিদের কথা তোলা বাহুল্য। তাদের ঘরে হামলা সেই রাত্রেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু অনেকে ছিলেন সরাসরি মুখপাত্র নন, কিন্তু তাহাদের কায়িক উপস্থিতি রাজনৈতিক প্রবাহের স্মরণিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই নেপথ্য-নায়কদের হত্যার তালিকায় বিশেষভাবে গেঁথে নিয়েছিল হামলাদারেরা।

‘আগরতলা ষড়যন্ত্র’ মামলার কথা অনেকে ভুলে গিয়েছেন। বারো বছর অতিবাহিত। বহু স্মৃতির মত ঝাপসা হয়ে যাওয়ার কথা। ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে মিথ্যে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় জড়ায়। তার সাক্ষী-সাবুদ সবই পাকিস্তান সরকারের যোগ-সাজস, বানোয়াট ব্যাপার। অভিযোগ করা হয় যে, শেখ মুজিব ভারত সরকারের সংগে সহযোগিতায় এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানে লিপ্ত। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যেই শেখ মুজিবের এই ষড়যন্ত্র। তাঁর সংগে অভিযুক্ত হন পাকিস্তান নৌ ও সেনাবাহিনীর আরো বারো জন অফিসার। আসলে ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ‘ছয় দফা” দাবী জনমনে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। বঙ্গবন্ধুর বিগত ছাব্বিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনও তখন আর এক গুণান্বিত পর্যায়ে উন্নীত। দেশের কোটি কোটি মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ-পন্হা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এই গণ-তরঙ্গ রোধ করা প্রয়োজন। পাকিস্তানের শাসকবর্গ রাজনৈতিক ভাবে আর তার মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। তাদের সব জারিজুরী তখন জনসাধারণ ধরে ফেলেছিল। শোষণ অব্যাহত রাখার ছল-চাতুরী ত চেনা কয়েকটি পন্হা। এক, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ক্ষতি মানে ইসলামের ক্ষতি। (পবিত্র ধর্মের দোহাই আর তেমন কার্যকর ছিল না।) দুই, প্রাদেশিকতা ইসলাম ধর্মে শক্ত গুনাহ—পাপ। (অর্থাৎ নিজের অধিকার বুঝে নিতে চাওয়া পাপ।) তিন, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলন আসলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের উস্‌কানি। হিন্দুদের কারসাজি। পূর্ব পাকিস্তানী দালালদের সহযোগ ছিল পাকিস্তানী প্রচারের পক্ষে, তা বলা বাহুল্য। কিন্তু এসব ফন্দী আর জনমনে দানা বাঁধতে অক্ষম। তাই আন্দোলনের মূল নেতা শেখ মুজিবকে সরিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র। সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত-কে জুড়ে দাও। তা-হলে এক ঢিলে দুই পাখী বধ করা যাবে। ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের সময় তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানের মুখ্য মন্ত্রী (মরহুম) নুরুল আমিন এ্যাসেম্বলী অধিবেশনে একই চাল চালেন। ভারতীয় পত্রিকায় ভাষা-আন্দোলনের সমর্থন থেকে তিনি সিদ্ধান্তে পেঁছিলেন যে ভাষা-আন্দোলন বিদেশী শত্রুদের কারসাজি ছাড়া আর কিছু নয়। এবং পূর্বপাকিস্তানের

ধর্মপ্রাণ সরল বিশ্বাসী জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে প্রচারিত হোল ভাষা-আন্দোলন দেশী ও বিদেশী হিন্দুদের চক্রান্তের ফল। সেই পাকিস্তানী ঐতিহ্য বাংলাদেশের জন্মের পর আজও মুছে যায়নি। দেশের মঙ্গলকামী সৎ নাগরিকের চরিত্র-হননের ব্যাপারে একই অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়ঃ "ওরা ভারতীয় এজেন্ট, হিন্দুদের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত।" ১৯৬৯ সনে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আন্দোলন প্রতিরোধ-খাত বয়ে আসে "আগরতলা ষড়যন্ত্র" মামলা। অভিযোগ প্রমাণিত হলে চরম শাস্তি প্রাপ্য অর্থাৎ মৃত্যুদন্ড। বেসামরিক কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার—শামসুর রহমান খান, যিনি বিদ্যামত্তার জন্যে বন্ধু-বান্ধব মহলে ডক্টর জনসন-নামে খ্যাত, রুহুল কুদ্দুস, যার কট্টর বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা-সম্পর্কে পাকিস্তানী শাসকদের কোন সন্দেহ ছিল না—কে-ও ওই মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মামলা চলার সময় শেখ মুজিবের মুক্তি-আন্দোলন এমন বিপুল আকার ধারণ করে যে পাকিস্তান সরকারের নতি স্বীকার ছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না। সেই গণ-তরঙ্গ আর থামেনি। ১৯৭১ সনে শেষ ফয়সালা হয়ে যায়, যার ফলে আমরা আজ সকলে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। আসলে মামলাটি ছিল সম্পূর্ণ ভূয়া, ঝুটের উপর তার সকল বুনিয়াদ। বঙ্গবন্ধু সব সময় শাসনতান্ত্রিক রাজনীতি বা কনসটিটিউশনাল পলিটিক্‌স করেছেন। বিপ্লব বা অস্ত্রপ্রয়োগের সাহায্যে কোন রাজনৈতিক সমাধানের কথা তিনি ভাবতেন, এমন অপবাদ কোন শত্রুও দিতে পারবে না। বাঙালী রাজনীতিবিদদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর তুলনা চলে শুধু নেতাজী সুভাষ বসুর সংগে। উভয়ে বাঙালীকে আবেগের জগতে তাদের স্বজাত্যের (আইডেন্টিটির) শিকড় দিয়ে গেছেন। সুভাষ বসু শেষ পর্যন্ত অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শেখ মুজিব শেষে অস্ত্রের শিকার হলেন, নিজের হাতে অস্ত্র কোনদিন তুলে নেননি। পুরোপুরি বেসামরিক-সিভিল রাজনীতিবিদ অথচ, পাকিস্তান সরকার মিথ্যার আশ্রয় নিতে যেন এক পা বাড়িয়েছিল। রাষ্ট্রের নাম ইসলামিক রিপাবলিকান অব পাকিস্তান। পবিত্র ইসলাম ধর্মের বেইজ্জতি শত শত বৎসর চলে আসছে। এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই অবমাননাকারী প্রত্যেক দেশের শোষক ও শাসক সম্প্রদায় এবং তা সম্পাদিত হয় ইসলাম ধর্মের দোহাই মেরে। এমন-কী, কোন অ-মুসলমান সে যতই সৎ হোক না কেন, ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট হতে পারবে না। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে কনস্‌টিটিউশানে তা স্পষ্ট লেখা আছে। অথচ, বিভিন্ন ধর্মবলাম্বী-হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বাস যে-দেশে এবং যার শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার স্পষ্ট উল্লেখ আছে—সেই ভারতবর্ষ

হয়ে পড়ে শুধুমাত্র হিন্দুদের বাসস্থান এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চক্রান্তের ঘাঁটি। যে যা খায়, তারই ঢেকুর তোলে। পাকিস্তানের মুখ থেকে অন্য কোন উদ্গার আশা করা অন্যায়। দ্বিজাতি তত্ত্ব আজ ভূয়া প্রমাণিত। মিথ্যের বেসাতির উপর ওই রাষ্ট্রের পত্তন শুরু হয়। মিথ্যে ঢাকতে আরো প্রচুর মিথ্যা জড়ো করা ছাড়া উপায় থাকে না। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা তারই অনুসৃতি মাত্র। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থিত এই এলাকা। বাংলাদেশের সীমান্তের সংগে বার্মা বা ব্রহ্মদেশেরও যোগাযোগ রয়েছে। মামলা যখন মিথ্যে তখন 'আরাকান' ষড়যন্ত্র নামেও তা চালু করতে আপত্তি ছিল কোথায়? কিন্তু বর্ণবিদ্বেষ-জাত রাষ্ট্র আর অন্য কিছু কল্পনা করতে অক্ষম। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে হিন্দু অধিবাসী আছে। ত্রিপুরা রাজ্যেও আছে। সুতরাং অধিবাসী "হিন্দু-মুসলমান" জিগীর-তোলা রাষ্ট্র সোজা আগরতলাই চোখে দেখতে পেয়েছিল। "ছয় দফা" আন্দোলনের উদ্গাতা শেখ মুজিবকে মামলার জালে আটক করা গেল না। বুমেরাং রূপে তা পাকিস্তান রাষ্ট্রের বুনিয়াদ টলিয়ে ছাড়ল।

কিন্তু "আগরতলা ষড়যন্ত্রের" আসামীদের ত পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষেরা সহজে মাফ করে দিতে পারে না। মামলায় জড়িত ছিলেন অন্যান্য সামরিক-বেসামরিক অফিসার। ক্যাপ্টেন মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁদের অন্যতম। এঁদের সকলের অপরাধ ছিল একটাই ঃ পূর্ব পাকিস্তানের দাবী দাওয়া নিয়ে সোচ্চার আলোচনা। আর্মি-মেসে তারা মনের কথা গোপন করতে শেখেন নি। কর্তৃপক্ষ অনেক আগে থেকেই এই সব অবাধ্য অফিসারের উপর নজর রেখেছিল। সুযোগ পাওয়া মাত্র তাদের ফাঁসিতে লটকানোর ফন্দি কষা। কিন্তু ফাঁসি দেওয়া গেল না। দেশের মানুষ তাদের বুকে জায়গা করে দিল। সেই স্রোতে ভেসে গেল ষড়যন্ত্রের ফাঁদ। ক্যাপ্টেন মোয়াজ্জেম হোসেন মুক্তি পেয়েছিলেন, বলা বাহুল্য।

কিন্তু হিসাব নিকাশ শেষ হ'ল না। মুক্তি পাওয়ার পর ক্যাপ্টেন মোয়াজ্জেম হোসেন বঙ্গবন্ধুর অনুসারী হয়ে পড়েন। মর্মে-তেজ থাকলে কর্ম তাদের সহজে টেনে নিয়ে যায়।

মোয়াজ্জেম সাহেব এলিফ্যান্ট রোডে থাকতেন সপরিবারে। বৃদ্ধ মা-বাপও ওঁর সংগে ছিলেন।

পঁচিশ মার্চের রাত্রে গুলিগোলা শুরু হওয়ার পর তিনি অন্যত্র কোথাও যাওয়ার কথা ভাবেন নি। যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তিনি আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় কেউ নন। বঙ্গবন্ধুর সমর্থক। তা দেশের কোটি কোটি মানুষ। তিনি "আগরতলা ষড়যন্ত্র" মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন। হ্যাঁ, তা বটে! কিন্তু তা দু'বছর আগেকার ব্যাপার। নিরপরাধ

তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং, রাজনৈতিক হট্টরোলের-প্রবাহ থেকে নিরাপত্তা খোঁজার প্রশ্ন কোথায়? অপরাধ করলে প্রশ্ন হোত ভিন্ন।

কিন্তু ক্যাপ্টেন মোয়াজ্জেম হোসেন হিসাব-নিকাশে ভুল করেছিলেন।

দুপুর রাত্রের সামান্য পরে তার এলিফ্যান্ট রোডের বাসার সামনে আর্মি-জীপ থামল। ষ্টেন্‌গান হাতে কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্য নেমে পড়ে দরজায় ঘা দিল।

বাড়ীর কেউ ঘুমায়নি। ক্যাপ্টেন মোয়াজ্জেমের মা-বাপ উভয়ে বেরিয়ে এসেছেন। সামনে ক্যাপ্টেন সাহেব নিজে।

এক জওয়ান মোয়াজ্জেম হোসেনের হাত ধরে উঠানে টেনে নিয়ে এলো। তারপর গুলি। বয়সের শেষ প্রান্তে এসে মোয়াজ্জেম সাহেবের বৃদ্ধ পিতামাতা পুত্রের জীবনের সমাপ্তির এই দৃশ্য দেখার জন্যে যেন বেঁচে ছিলেন অমন বয়স নিয়ে।

শহীদ ক্যাপ্টেন-এর উঠানে লাশ পড়ে রইল। আর্মি জীপ বেরিয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন মোয়াজ্জেম হোসেন হিসাব নিকাশে ভুল করেছিলেন।

ভুলের বড় চড়া মাশুল দিতে হয় কখনও কখনও।

হ্যাঁ, ভুলের মাশুল বড় চড়া দিতে হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মহান ঔদার্যে তাঁর বুকে শত্রুমিত্র সকলের ঠাঁই করে দিয়েছিলেন। প্রতিশোধ-পরায়ণতা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই দুশমনেরা মাকড়শার বাচ্চার গ্রাসের মত যে-জঠরে বাস এবং যেখানে লালিত পালিত হয়, জন্মের পর সেই জঠরই বিদীর্ণ করে ছাড়ল। শত্রুর বুলেট বঙ্গবন্ধুর মরদেহ ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। ভুলের জরিমানা আছে, তা স্বতঃসিদ্ধ।

আরো ভুল অনেক করেছিলেন বৈকি। এক জনের নাম উল্লেখ অন্যত্র ফেলে রাখা অপরাধ—আজকের এই স্মৃতিচারণার মুহূর্তে।

ভুল করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সালাহ্‌উদ্দীন। ঠাকুরগাঁ বীরগঞ্জ এলাকায় কযারানীগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতা-পাগল বীর সেই তরুণ। সাত মাস লড়েছিল বিভিন্ন দায়িত্ব মাথায়। দুঃসাহসের পরীক্ষায় এমন উত্তীর্ণ জনের সংখ্যা বিরল। শত্রু এলাকায় প্রহরীর চক্ষু এড়িয়ে যাতায়াত তাঁর কাছে কঠিন কিছু মনে হ'ত না। মহান এই প্রাণ ভুলের শীকার হয়েছিল।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ প্রান্তে নভেম্বর মাসের প্রথম হপ্তায় সালাহ

উদ্দীন শুনলেন তাঁর আব্বাকে মিলিটারীরা ধরে নিয়ে গেছে এবং চাপ দিচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের হাল-হদিস বের করার জন্যে। দেশ-প্রেমিকের বুকে ভালবাসা, ভক্তি নেই কে বলবে? স্বভাবতঃই পুত্র চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বাড়ীর খবর একবার নেওয়া দরকার। ক্যাম্প থেকে ছুটি নিয়ে সালাহ্উদ্দীন নিজের গ্রাম কষারানীগঞ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হন। যাতায়াত বিপজ্জনক। রাজাকারদের হাতে পড়ার ভয় আছে। শান্তি কমিটির চেনাশোনা কেউ দেখলে তাকে নির্ঘাং ধরিয়ে দেবে। তবু বেপরোয়া তরুণ ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তার আশংকা অমূলক ছিল না। অশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও গ্রামে আসার সময় তাকে এক দালাল দেখে ফেলেছিল। সালাহ্উদ্দীন অবশ্য টের পাননি। কয়েক মাসের ছাড়াছাড়ি বাপ মার সঙ্গে। এমন ক্ষেত্রে পারিবারিক পুনর্মিলনের দৃশ্য কল্পনা করা যায়। মা যথাসাধ্য যত্নে পুত্রের আহারের বন্দোবস্ত করছিলেন। কিন্তু খাওয়ার অক্তে বাড়ীর সামনে মিলিটারী জীপ এসে থামল। আহার পাতে পড়ে রইল। বাবা মার নিদারুন অনুনয় জন্তুর সামনে কোন কাজে লাগবে? সালাহ্উদ্দীনকে জওয়ানেরা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। অনিশ্চিত অন্ধকারের যাত্রা। সালাহউদ্দীনের মত তরুণের প্রাণের মায়া কোনদিন ছিল না। মন্ত্রের সাধন যেখানে মুখ্য কথা সেখানে শরীর তুচ্ছ হয়ে যায়। সালাহউদ্দীন ভেবেছিলেন খবর পাওয়ার জন্য মিলিটারীরা তার উপর দৈহিক নির্যাতন চালাবে। তা যত খুশী চালাক। কী আসে যায়। মুক্তিবাহিনীর কোন খোঁজখবর আদায় করতে না পারলে শারীরিক জুলুমের ভেতর দিয়ে জীবন শেষ হবে অথবা শেষ গুলী করে মারবে। পরিণাম যখন এক এমন পন্হা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? সালাহউদ্দীন এখানেও ভুল করেছিলেন। মানুষের কুলে জন্ম। তিনি মানুষের মত যুক্তিবিচারের সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছান। কিন্তু জন্তুর আওলাদ জন্তুরা কী চিন্তা করে তা তিনি জানতেন না। শত প্রকার দৈহিক নিপীড়নের ফল পাওয়া গেল ঃ মুক্তিবাহিনীর সৈনিকের নিকট তার হদিস অজ্ঞাত।

ঠাকুর গাঁ ইপিআর হেড কোয়ার্টারে তখন কর্তা ছিল মেজর মাহমুদ হাসান বেগ। নরাকার এই জন্তু-জল্লাদের আর কিছু নেই থাক তার অত্যাচার-পন্হা উদ্ভাবনের প্রবল কল্পনা-শক্তি ছিল, তা যে কেউই মেনে নেবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের সুশীতল ইসলামী আদর্শের ছায়ায় পালিত এক সৈনিকের আচরণের নমুনা দেখুন।

ইপিআর হেড্কোয়ার্টারে দু'টি চিতা বাঘ পোষা হয়েছিল। স্থানীয় লোকেরা মাঝে মাঝে দেখতে আসত। মিনি বা ছোট চিড়িয়াখানা দরিদ্র

দেশে প্রচুর তৈরী করা যায় না। অথচ মানুষের জীবজন্তু প্রাণী দেখার কৌতূহল থাকে। এমন মানসিকতা থেকেই হয়ত জোড়া চিতার অভ্যুদয় এই হেডকোয়ার্টারে।

মেজর মাহমুদ হাসান বেগ মুক্তিবাহিনীর এই সদস্যের কাছে হার মেনেছিল। কোন খোঁজ খবর আদায় করা গেল না। শত নির্যাতনেও সে কোন কিছু বলতে নারাজ।

মেজর বেগ তাই সিদ্ধান্ত নিল, সালাহউদ্দীনকে চিতা বাঘের খাঁচায় ফেলে দেওয়া হবে। এবং হাত ও পা বাঁধা অবস্থায়।

ব্যাপারটা তামাসা। বাঘের নরহত্যা ত কেউ চোখে দেখে না। এমন দর্শনীয় দৃশ্য তামাসা বৈকি। আশেপাশে তাই ঢোল শহরৎ দেওয়া হলো, পাকিস্তান-বিরোধীদের শাস্তি কী ভাবে হয়, তা যেন সকলে দেখে যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী এক জন বীর তরুণের এই মর্মান্তিক পরিণতি কোন বাঙালী নিজের চোখে দেখতে পারবে ? কিন্তু এক শ্রেণীর নরাধম পৃথিবীতে আসে যারা নিজের মা-বোনের ধর্ষণ-দৃশ্য দেখার জন্যে কৌতূহলী চোখ খোলা রাখতে পারে। সালাহউদ্দীনের মৃত্যু দেখার জন, জড়ো হয়েছিল আলবদর রাজাকার বাহিনীর সদস্য এবং শান্তি কমিটির মাননীয় কিছু লোক। আর কলিজা দুই হাতে চেপে দু'এক জন সাহসী পুরুষ এসেছিল পরবর্তী কালে ইতিহাসে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে। তারা নির্মম চোখ খোলা রাখতে পারেনি। বুকের জমাট কান্না আবছা দৃশ্য রূপে তাদের দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছিল মাত্র।

ক্ষুধার্ত চিতা বাঘের খাঁচা। ভেতরে পায়ে শিকল, পিঠমোড়া বাঁধা দুই হাত অবস্থায় এক তরুণ তার ভেতর দাঁড়িয়ে। কয়েক পলক মাত্র। হিংস্র জন্তু তারপর নিজের শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিলে তিলে সেই মৃত্যু-দৃশ্যের বর্ণনার প্রয়োজন কোথায় ?

খাঁচার ভেতর হিংস্র জানোয়ার।

বাইরে দর্শক। হিংস্র জন্তুর সহোদর, শুধু অবয়বে মানুষ।

ইপিয়ার হেড কোয়ার্টারে চিতার মুখে সাড়ে তিন শ' মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন সময়ে নিজেদের উৎসর্গ করে গেছেন।

আত্মবিস্মৃত, গোলাম বাঙ্গালী মুসলমান। দাসত্বের শিকল, ডাণ্ডা-বেড়ি ছাড়া যেন তাদের আত্মার বিকাশ ঘটে না, মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায় না। তাই সালাহউদ্দীনের মতো অন্যান্য বীর ভ্রাতাদের নামও আজ অজ্ঞাত। কোন স্মৃতির ফলক নেই কোথাও।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসী জুলুমের নানা নারকীয় ঘটনা পৃথিবীর মানুষ জানে। কিন্তু বাঘ দিয়ে কোন দেশ-প্রেমিককে (ধরে

নেওয়া যাক তারা ভ্রান্ত) খাওয়ানোর কল্পনা হিটলারের স্টর্ম-ট্রুপারও (ঝটিকা বাহিনী) ভাবতে পারত না। চব্বিশ বছরে ইসলামী রিপাবলিক অফ পাকিস্তানের দানব বাহিনী যে-কাণ্ড যে-তাণ্ডব চালিয়ে গেছে প্রাক্তন পূর্ব-পাকিস্তানের উপর দিয়ে তা মানুষের ইতিহাসে নজীর-বিহীন।

পবিত্র ইসলাম ধর্মের দোহাই মেরে এমন জঘন্য ব্যাপারও ঘটে, দুঃখ সেই খানেই। অথচ ধর্মপরায়ণ, পরহেজগার মানুষ কী এদেশে নিজেদের আত্মাকে জিজ্ঞেস করেন, ধর্মের নামে এমন নারকীয় আচরণ কেন ঘটে? অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া উচিত। কিন্তু শাস্তিদানের মধ্যে যেন মানবিক সম্মান না ক্ষুন্ন হয়, সেদিকে শাস্তিদাতা বা বিচারের মালিকেরা যেন অন্ধ না হন। মেজর মাহমুদ বেগ-কে শুধু অপরাধী করা চলে না। তার মত জন্তুকে যারা ইসলামী রাষ্ট্রের জনসাধারণের পয়সায় বছরের পর বছর পোষণ করেছে, লালন করেছে তোয়াজের সঙ্গে, চিড়িয়াখানার সেই পশুপালকরাই আসল ক্রিমিন্যাল।

তারা সুদূর ইসলামাবাদে বসে ছিল। রাজধানী ইসলামাবাদের ইতিহাস, বোধ হয় অনেকে জানেন না। জেনে রাখুন।

প্রথমে পাকিস্তানের রাজধানী ছিল করাচী। সেখানে চলত বেসামরিক প্রশাসনের কাজ। কিন্তু সামরিক হেড-কোয়ার্টার রাওলপিণ্ডি শহরে। অত দূরে। বেসামরিক রাজনীতিবিদগণের বিরুদ্ধে মিলিটারীদের কী ষড়যন্ত্র চলে, তা জানার উপায় ছিল না। আইয়ুব খান ১৯৫৮ সনের ক্যুর পর স্থির করলে অর্থাৎ মিলিটারী শাসক প্রশাসকবর্গ সিদ্ধান্ত নিল, সামরিক বেসামরিক হেড কোয়ার্টার এক জায়গায় হওয়া উচিত। কারণ, এখন রাজদণ্ড তাদের হাতে। বেসামরিক রাজনীতিবিদেরা যে ভুল করেছিল, তা থেকে সামরিক প্রভুরা প্রচুর শিক্ষা পেয়েছিল। তাই স্থির হলো রাওলপিণ্ডি থেকে দশ মাইল দূরে পাটোয়ার ভ্যালি বা উপত্যকায় রাজধানীর নতুন পত্তন দরকার। ১৯৬২ সনে এই শাদ্দাদের বেহেশ্ত তৈরী হয়। খরচ প্রথম পর্যায়ে মাত্র ১৬০০ ষোল শ' কোটী টাকা। সুদূরে সোয়াত থেকে পাহাড় কেটে কেটে ওই ইমারতের জন্যে নানা রঙের পাথর আনা হয়। প্রকৃতির নক্শা-কাটা সেই মোজেক দেওয়াল দেখলে বুঝতে পারতেন, টাকা পয়সা খরচ নির্মাতাদের জন্যে সমস্যা ছিল না। ১৯৬২ সনে পূর্ব-পাকিস্তানের বাজেট ছিল মাত্র ১৬৭ এক শ' সাতষট্টি কোটি টাকা। এখানে অবিশ্যি আহাম্মক পূর্বপাকিস্তানীদের বুঝ দেওয়ার জন্যে "সেকেণ্ড ক্যাপিটাল" এর ভিত্তি স্থাপিত হয়। অপব্যয়ের নমুনা দেখে ইসলামাবাদে তখনই, এক মার্কিন সাংবাদিক মন্তব্য করেছিলেন, 'ইউ শুড হ্যাভ ডান ইট লেটার—তোমাদের

এসব আরো পরে করা উচিত ছিল'। ইসলামাবাদের আমিরুল মুমেনীনরা এমনই ইসলাম 'আবাদ' করলেন যে পাকিস্তান দু-টুকরো হয়ে গেল। বঞ্চনার মসনদ-কে ধর্মের লেবাস পরিয়ে হাসিল করতে গেলে এমনই পরিণাম ঘটে। আরো আসল কথায় আসা যাক। পাটোয়ার ভ্যালি ছিল পাহাড়-গুহা জংগলাকীর্ণ পরিত্যক্ত জায়গা। অবিশ্যি সমতল জমিও প্রচুর। রাজধানী তৈরীর জন্য উত্তম পরিবেশ। দেশের আর্থিক উদ্বৃত্তি বা ইকনমিক সারপ্লাস থাকলে তেমন গঠনমূলক কাজে কেইবা আপত্তি তুলত? কিন্তু আজ মনে হয় সামরিক প্রভুদের ঐ জায়গা বেছে নেওয়ার মূলে ছিলঃ পাটোয়ার ভ্যালির ঐতিহ্য-রক্ষা। রাজধানী হওয়ার পূর্বে পাটোয়ার ভ্যালি ছিল বিপজ্জনক জায়গা। চোর ডাকাতের আশ্রয়-স্থল। বনের আড়ালে গুহার ভেতর অন্য এলাকা থেকে লুটতরাজ করে ফিরে আসত ডাকাতরা। লুকিয়ে থাকার জন্যে তোফা এই গুপ্ত-নিবাস।

নতুন যুগের দস্যুরা তাদের হটিয়ে দিল। পুরাতন ডাকাতেরা কী-বা লুট, কত জন-ই বা খুন বা হত্যা করত? একটি দুটি গেরস্থ-ঘর—যাদের মালমাত্তা আছে। দরিদ্রের ঘরে ডাকাতি হয় না। নতুন দস্যুরা গুণান্বিত দস্যু। পুরাতনদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। তাদের ধরন-ই আলাদা। তারা লুট করে এলাকার পর এলাকা—প্রদেশের পর প্রদেশ—সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পূর্ব-পাকিস্তান। বিত্তহীনদেরও রেহাই নেই তাদের থাবা থেকে। গরীব চাষী মজুর হলো আরো গরীব, আরো নিরন্ন। "আল্লা রুজির মালিক" ধর্মের এই দোহাই মেরে তারা নিজেদের অপরাধ ঢাকা দিতে প্রচণ্ড রূপে দক্ষ। লুট-করা ধনের কিছু অংশ দিয়ে তারা ধর্মের ব্যাপারী নিয়োগ করে পবিত্র ইসলামের নামে পবিত্র ইসলামের অবমাননার জন্য। আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বন্ধু ছিলেন দীন অসহায়ের, বঞ্চিতের নিরন্নের ভুখা-নাংগা আশ্রয়হীনের। আর ওই ধর্মের ব্যাপারীরা, কেউ কেউ আবার 'কেব্‌লা পীর' নামে খ্যাত, সকলেই বিত্তবান দস্যুদের প্রচার-সচিব হয়ে ওঠে কী ভাবে, ভেবে কুল পাওয়া দায়?

পাটোয়ার ভ্যালির দস্যুদের ঐতিহ্য রক্ষার্থে নতুন দস্যুরা রাজধানীর নামাকরণ করে কিন্তু ইসলামাবাদ।

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের মতই আর এক নাম মহাম্মদপুর। প্রিয় রসুলের নামের সহিত জড়িত যে-ঠাঁই, তার বৈশিষ্ট্য, মাহাত্ম্য বা

পবিত্রতা কেমন হওয়া উচিত ? নিশ্চয় সেখানে নিষ্ঠুরতা বা কোন রকমের আবিলতার কোন স্থান নেই। ইতিহাসে তেমনই বনিয়াদের কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই এলাকা।

কিন্তু গোড়ায় গলদ দেখা গেল। কারণ, গোড়ায় গলদ ছিল। অনেকের কাছে কথাটা হেঁয়ালি মনে হতে পারে। কিন্তু না সেখানে দুর্বোধ্য অন্ধকার কিছু নেই।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমান তাদের কাঙ্খিত প্রার্থিত আবাস ভূমির দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি সেই তীর্থে পৌঁছানোর জন্যে নিজেদের পুরাতন আবাস-স্থল ত্যাগ করবে, তা বিচিত্র কিছু নয়। কিছু দিনের প্রতীক্ষা এবং ধৈর্যের পর পাওয়া "মঞ্জিলে মকসুদ" "অভীষ্ট গন্তব্য" কে-ই বা অবহেলা করতে পারে ? তাই দেশ-বিভাগের পর ভারতের মুসলমানেরা আপন আবাস-ভূমি পাকিস্তানের পানে হিজরৎ করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান আবার দুই খণ্ড। একই সঙ্গে মানুষের পক্ষে দুই দিকে যাত্রা সম্ভব নয়। তাই কেউ মুখ ফিরিয়েছিল পশ্চিমের দিকে, কেউ পূর্বের দিকে। পূর্বে এসেছিল বেশীর ভাগ বিহার, সংযুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি এলাকার মুসলমান। কিছু দক্ষিণ ভারত থেকে। অনেকে গিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। তারা অধিকাংশ উত্তর ভারতের অধিবাসী।

সেই মহাযাত্রার কথা পঁয়ত্রিশ বছর পরে আর স্মরণ না করাই ভাল। এমন বিরাট হিজরৎ আর পৃথিবীতে কোন কালে কোথাও হয়নি। লাখ লাখ আবাল বৃদ্ধ বণিতা পুরুষানুক্রমিক বহুকালের আবাসভূমি ছেড়ে অন্ধকার ভবিষ্যতের স্রোতে ঝাঁপ দিয়েছিল। পাকিস্তান-শব্দ তখন অধিকাংশ মুসলমানের কাছে ছিল ঐন্দ্রজালিক শব্দ বিশেষ। অনুপ্রাণিত সম্মোহিত জনের কাছে যুক্তিবিচারের প্রশ্ন সেদিন ছিল না। হাতেম তাঈয়ের কাহিনীর মত এই ডাকও যেন "কোহে নেদা" পর্বতের আহ্বান বিশেষ। ডাক এসেছে। অতএব, এগোও। আর মনে অন্য কিছু জায়গা দিও না। লক্ষ লক্ষ নরনারী সেদিন গৃহ পরিত্যাগ করেছিল। সবাই কী গন্তব্যে পৌঁছাতে পেরেছিল সেদিন ? না। শত শত মাইল পথ। নিরাপত্তাহীন পথ, ব্যাধি, ক্ষুধা, চোর দস্যু দাংগাবাজের থাবা প্রায়ই ওৎ পেতে থাকত। এত বাধা বিপত্তি ঠেলে সকলের পক্ষে এগোনো কঠিন ছিল। কত জন যোধপুর, রাজপুতানার মরুভূমির বুকে হারিয়ে গেছে, কতজন ক্ষুৎ পিপাসায় মরেছে তার হিসাব কেউ কোনদিন গ্রহন করেনি। তাই বলছিলাম, পুরাতন ঘা আবার চুলকানির মুখে ঠেলে দিয়ে নাফা কী ? তবু অনেকে পৌঁচেছিল অভীষ্ট স্বদেশে, যদিও নতুন স্বদেশ। কিন্তু

গোটা পৃথিবী-কে স্বদেশ রূপে আর ক' জনই বা গ্রহণ করতে পারে? তাদের সংখ্যা খুবই কম। সাধারণ মানুষ নিজের পরিবেশ, আবহাওয়া' প্রাকৃতিক বেষ্টনী, ভাষা, যুগ-যুগান্তের মানস-সম্পদের ছাপের ভেতরই নিজেকে খুঁজে পায়। সুতরাং নতুন জায়গা সহসা আপন হয়ে ওঠে না। অনেক অভাব থাকলেও দু'একটা বিশেষ অভাব যেন অন্ততঃ মেটে—সকলে এই আশা পোষণ করে। হয়ত প্রাকৃতিক আবেষ্টনী আলাদা, তবু আশপাশে যদি মানুষ থাকে, যাদের সঙ্গে সুখ দুঃখের বিনিময় আলাপ মারফৎ করা যায়, তাহলে যেন অকূল দরিয়ায় একটা ভাসমান তক্তা পাওয়া গেল। ধর্ম হয়ত আলাদা, তবু ভাষা যদি এক হয় বিরাট সান্ত্বনা। যাযাবরেরা কিছুদিনের আবাস ত্যাগ করে। কিন্তু যেখানে যায়, দল বেঁধেই যায় এবং আবার মিলিতভাবেই নতুন আস্তানা পাতে। তার কারণ, আত্মার নৈকট্য-সন্ধান। ভাষার মাধ্যমে অচেনা পরিবেশে, দুঃখের দিনে যতো সহজে মেলে আত্মার নৈকট্য, তা আর কোন কিছু দিয়ে পাওয়া সম্ভব নয়। ক্ষুধার্ত অবস্থায় কেউ আহার দিলে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা বাড়তে পারে। কিন্তু উপকারীর ভাষা যদি নিজের ভাষা না হয়ে আর কিছু হয় তবু ফাঁক থেকে যায়। এমন কী কৃতজ্ঞতারও পূর্ণ প্রকাশে বাধা পড়ে। তাই যাযাবরেরা নতুন আবাস তৈরী করতেও দল বাঁধে। পাকিস্তানের জন্মের পর এমন স্বাভাবিক নিয়মের কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

পূর্বপাকিস্তানে ভারত-আগত শরণার্থী বা মোহাজেরগণ আবার নতুন নীড় গড়তে লাগল এবং দল বেঁধে। মুসলিম লীগ নেতাদের দূরদৃষ্টি থাকলে উন্মূল এই সব নর-নারীদের এক একটি পরিবার এক পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় লোকদের মধ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করত। তারা কালক্রমে স্থানীয় আবেষ্টনীর সঙ্গে মিশে যেত। কিন্তু তা হয়নি। দু'টিই ইংরেজী শব্দ ঃ "রিফিউজী কলোনী।" কিন্তু এই উপমহাদেশে এখন শব্দ দু'টি স্থানীয় ভাষা হয়ে গেছে। মারাঠি, তামিল, তেলেগু, হিন্দী, উর্দু, বাঙ্গলা ইত্যাদি ভাষায় রিফিউজী কলোনী পরিচিত। স্থানীয় চিরাচরিত পুরুষানুক্রমে বসবাসকারীরা জানল, তাদের বাস-ভূমি সমুদ্রের মাঝখানে এক ধরনের দ্বীপ উঠেছে রাতারাতি—তার নাম "রিফিউজী কলোনী"। আদর্শ যতদিন না বাস্তব হয়, তা মরীচিকার মত কাজ করে—নানা রঙ্গের ঝলকে তা ঝল্‌সাতে থাকে। কিন্তু বাস্তব রূপ পাওয়ার পথে আদর্শের মরীচিকার আদল বদলে যায়। ভাষা-পরিবেশ বাদ দিয়ে ভারতের সব মুসলমান ভাই-ভাই হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান আন্দোলন চলার সময়। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর দৈনন্দিনতার সমস্যা আছে। তা মানুষকে ঠেলে ঠেলে আর এক দিকে

নিয়ে যেতে বাধ্য। কারণ, চোখের সামনে আর ত মরীচিকা নেই। অর্থাৎ, স্বপ্ন ভাঙ্গার পর ত স্বপ্ন-কালীন অবস্থা থাকতে পারে না। রিফিউজী কলোনীর অধিবাসীদের নতুন নামাকরণ ঘটল ঃ রিফিজী মোহাজের, শরণার্থী ইত্যাদি। তারা আর এক শ্রেণীর জীব পুরাতন এলাকাবাসীদের কাছে। সংখ্যালঘিষ্ট মুসলমানদের দাবীদাওয়া নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হয়েছিল। দেখা গেল, পাকিস্তান সৃষ্টির পর আর এ ধরনের সংখ্যালঘিষ্ট বা মাইনরিটির জন্ম হ'ল। তারাও মুসলমান, কিন্তু এক এক এলাকায় মাইনরিটি। সংখ্যায় কম নয় শুধু তাদের চালচলন, ভাষা স্থানীয় অধিবাসীদের থেকে আলাদা। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই মানুষের আদিম লড়াই। যদি জীবন-বিকাশের উপায় সকলের জন্য প্রশস্ত থাকে, তখন বাঁচার লড়াই খুব বিকট কদাকার কিছু রূপে দেখা দেয় না। যদি দেখা যায়, সকলের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, আহারের ব্যবস্থা নেই, বস্ত্র নেই, তখন নির্মম প্রতিযোগিতা শুরু হয় শুধু বাঁচার জন্যে। তার মুখে ধর্মের বড় বড় বুলিও বাৎ-কা-বাৎ, কথার কথা হয়ে দাঁড়ায়। এমন কী ধর্মও মানুষের চলা-পথের দিশারী প্রদীপ হয়ে থাকে না আর। শত শত বছরের বিদেশী ইংরেজের শোষণ এদেশের আর্থিক-সামাজিক নৈতিক সব রকমের মানবিক মেরুদণ্ড নড়বড়ে করে ছেড়েছিল। যখন ইংরেজ এদেশ ছাড়ল তখন চতুর্দিকেই অনটন-হাহাকার। তবু আবার সোজা দাঁড়ানো যেত, যদি গোড়া থেকে মুসলিম লীগের নেতাদের চোখে থাকত মানবতা-তৈরীর স্বপ্ন। কিন্তু মুসলিম লীগ মুসলমান উঠতি মধ্যবিত্ত মুসলমানের মুখপাত্র-রূপেই বল-সঞ্চয় করে। সাধারণ মানুষকে তারা টেনে এনেছিল স্রেফ লোভ দেখিয়ে এবং সেই জন্যে ইসলাম ধর্মের মন্ত্র 'নারা' কণ্ঠে তুলে নিয়েছিল আপামর জনসাধারণ মুসলমানকে দলভুক্ত করতে। রাজনীতির কৌশল মাত্র। পাকিস্তান সৃষ্টির পর তাদের স্বরূপ বেরিয়ে পড়ল, মুখোশ খসে পড়ল। রাষ্ট্রযন্ত্র তারা এমনই বানালো যেন সাধারণ মানুষ শোষণের সামগ্রীই থেকে যায়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পঁয়ত্রিশ বছর চলে গেছে। আজ মুসলিম লীগ নেতাদের অদূরদর্শিতা এবং মোনাফেকির রূপ মানুষের কাছে স্পষ্ট। অন্ততঃ পূর্বপাকিস্তানের জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই শোষণের ভিতের উপর তৈরী পাকিস্তান আবার দু খণ্ড হয়ে গেল। আদিম পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই ভাবেই শুরু হয়। অতীতের কথা ধরে ভবিষ্যতের দিকে পদক্ষেপ। আবার গোড়ায় ফিরে যেতে হয়। রিফিউজী নামক এক শ্রেণী তৈরী অখণ্ড পাকিস্তানের মধ্যে। তারা নতুন আস্তানা গড়তে লাগল দল বেঁধে। কারণ আত্মার

নৈকট্য-সন্ধান। অন্ততঃ ভাষা যেন এক হয় বা মোটামুটি আলাপ মারফৎ সুখ-দুঃখের পারস্পরিক কাহিনী বিনিময় করা চলে।

পূর্বপাকিস্তানেও মোহাজেরের বা রিফিউজী কলোনী বিভিন্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হোল। পাকিস্তানের প্রথম যুগ মানুষের অস্তিত্ব-রক্ষার এক নতুন অধ্যায়। রাজশাহী চাটগাঁ, ঢাকা ও অন্যান্য এলাকায় ছিন্নমূল ভারতের অন্য প্রদেশাগত মুসলমানেরা আবার তাদের নতুন জন্মভূমির ঠিকানা খুঁজে পেল। মনে রাখা উচিত, রিফিউজীদের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ ছিল। রিফিউজী বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাস্তুহারা, দুঃস্থ দরিদ্র, ঠাঁই-ঠিকানাহীন মানুষের দল। কিন্তু এই ছবি সত্যি নয়। অনেকে রিফিউজী হয়ে এসেছিল, তারা কিন্তু দুঃস্থ দরিদ্র নয়। তারা ভারতে ধনবান ছিল, সঙ্গেও ধন-দৌলত এনেছিল। তারা কোন দেশত্যাগী হিন্দুর বাড়ীই কিনে ফেলল নতুন আস্তানা পাততে বা জমি কিনে ফেলল ভবিষ্যতের মুনাফার আশায়। কোন কোন রিফিউজীকে ছাউনীতে এক বেলাও কাটাতে হয়নি। টাকা-পয়সাও তাদের সঙ্গে অঢেল। সব মিলে ধীরে ধীরে সময়ের পরিসরে অনেকের জায়গা হোলো এই পূর্ব পাকিস্তানে। অনেকে অস্তিত্বের সংগ্রামে যুঝে উঠতে না পেরে পরলোকে চলে গেল। ব্যক্তিগত পর্যায়ে জীবনের কি রগড়ানি বহু রিফিউজী সয়েছিল, তার বিশদ কাহিনী আজ কেউ জানবে না। তবু আন্দাজ করা সহজ। কারণ, পরবর্তীকালে, হয়ত খুব কম সংখ্যায়, তবু রিফিউজীদের মধ্যে কিছু প্রচুর বিত্তবান হয়ে উঠল। আর বেশী সংখ্যার শরনার্থী শুধু দিন গুজরানে হাঁপাতে লাগল। ইস্পাহানী, দাউদ, সায়গাল প্রভৃতি রিফিউজী যারা ভারতেও বিত্তবান ছিল, এবার হিন্দু বিত্তবানদের প্রতিযোগিতাহীন পাকিস্তানী মাঠে মুনাফার গোল একের পর এক দিতে লাগল। কতো আঙ্গুল কলাগাছে পরিণত হোলো। ভারতে যার পুঁজি ছিল লক্ষ, পাকিস্তানে তারা কোটীপতি হয়ে উঠল খুব অল্প সময়ের মধ্যে। রাষ্ট্রের কর্ণধার ত তারাই। মুনাফার ঝোল তাদের কোলে যাতে আসে, তার ব্যবস্থাও গড়ে উঠল রাষ্ট্রের আইন-মারফৎ। রিফিউজীদের মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগ ছিল, তা জানাতেই এত প্রসংগ-বিস্তার। রিফিউজীদের মধ্যে মাঝারি গোছের কিছু বিত্তবানও গজিয়ে উঠল। তারা একদম দুঃস্থ নয়। তবে দরিদ্র, দুঃস্থ রিফিউজীর সংখ্যাই বেশী : নতুন পরিবেশে দল-বাঁধা যাযাবরের দল।

ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকা হয়ে পড়ল পুনর্বাসিত মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত রিফিউজীদের নতুন আস্তানা। আবার গরীব দুঃস্থ কায়ক্লেশে দিন গুজরান করে এমন রিফিউজির কলোনী গড়ে উঠেছিল ঢাকার

বাসাবো ও অন্যান্য এলাকায়।

আমাদের অকুস্থল মোহম্মদপুর। এইখানে আরো একটা কথা ব'লে রাখা দরকার। এই সব উর্দুভাষী রিফিউজিরা পাকিস্তানের রাষ্ট্রের কর্ণধারদের নিজেদের রক্ষাকর্তা মনে করতে লাগল। ব্যতিক্রম হয়ত ছিল। কিন্তু অধিকাংশ জনই নিজেদের এই প্রদেশে পরদেশী মনে করত। ভাষার ব্যবধান নয় শুধু, পাকিস্তান সরকারের রাষ্ট্র নীতির মধ্যে আপামর জনসাধারনের শ্রীবৃদ্ধি বা উন্নতি নিয়ে কোন মাথাব্যথা ছিল না। নানা রকম বিভেদের উপরই শোষণের ইমারৎ কায়েম থাকতে পারে। সুতরাং সেখানে যত রকম বিভেদ থাকে জনসাধারণের মধ্যে তা জীইয়ে রাখা ছিল পাকিস্তানী শাসকদের লক্ষ্য। একটা বিভেদ ত তারা হর অক্ত কাজে লাগাত। জনসাধারণের দৃষ্টি নিজেদের সমস্যার দিকে না যায়, তার জন্য প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র ছিল তাদের প্রধান চাঁদমারি বা টার্গেট। আর পাকিস্তানী নাগরিকদের মনে সে-ই ধারণা বদ্ধমূল করার জন্যে প্রচারণার অন্ত ছিল না। ভারতীয় রাষ্ট্র মানে হিন্দু রাষ্ট্র। ভারতে যে ছয় কোটি মুসলমান রয়ে গিয়েছিল, যারা ভারতকেই তাদের 'হোমল্যাণ্ড' আপন আবাসভূমি ব'লে গ্রহণ করেছিল, তা পাকিস্তানী শাসকেরা জানত। তবু ভানের আশ্রয়। অর্থাৎ, হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার জিগীর যা পাকিস্তান-সৃষ্টির পূর্বে প্রবাহিত ছিল, পাকিস্তান সৃষ্টির পরও তার প্রবাহ অব্যাহত রইল। এই অদূরদর্শিতার মধ্যেই পরবর্তী কালে বাংলাদেশ-পত্তনের বীজ নিহিত ছিল। বিভেদই কায়েমী স্বার্থরক্ষার প্রধান অস্ত্র। পাকিস্তানী কর্ণধারগণ তা জানত। সুতরাং আত্মহত্যার পথে আর কে এগোয় ? জিন্না সাহেব অবিশ্যি তার স্বপ্নের রাষ্ট্রে কেউ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান থাকবে না, সবাই পাকিস্তানী হয়ে যাবে—এমন ঘোষণা করেছিলেন শাসনতন্ত্র পরিষদে। তা যে লোক-দেখানো ষ্টান্ট্ বা বাক-বিজ্ঞাপন তা বেশ বুঝা যায়, যখন তিনিই পরে আবার বলেন, 'উর্দু এ্যান্ড উর্দু শ্যাল বী দি ষ্টেট ল্যাংগুয়েজ অফ পাকিস্তান—উর্দু একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" অর্থাৎ বিভেদই তাঁর কাছে জাতীয় অগ্রগতির দিকশূল হয়ে রইল। এই হলো পান্ডা নেতার মনোবৃত্তি। পরবর্তী মেজো-সেজো চুনোপুটিদের কথা আর বেশী কিছু না বলাই মঙ্গল। বিভেদের বিষে জর্জর পাকিস্তান। তার পূর্ব পশ্চিমে সে-বিষ জারিয়ে যাবে, তা দুঃস্থ গরীব রিফিউজীরা ও বিত্তবানদের ছলনা ধরতে পারেনি। শোষক গোষ্ঠীর শঠতার শিকার হয়ে রইল তারা।

মোহাম্মদপুর এলাকায় শুধু ভারতের অন্য প্রদেশ-আগত রিফিউজীদের এলাকা ছিল না। বিরাট এলাকা। পূর্ব পাকিস্তানী এদেশী বহু

নাগরিকও সেখানে বাড়ী ঘরদোর তৈরী করে ছিল। তবে মোহাম্মদপুরই হয়ে পড়েছিল উর্দুভাষী ভাইদের প্রধান ঘাটি, সংখ্যায় বিশেষভাবে দলবদ্ধ।

রাজনীতির স্রোতের বাইরে গোটা পূর্ব পাকিস্তানে কোন শুকনা ডাঙা ছিল না ১৯৭১ সনে। রিফিউজীরা প্রধানতঃ ক্ষমতায় আসীন কর্ণধারদের নিজেদের ত্রাণকর্তা, রক্ষক মনে করত।

পঁচিশে মার্চ ১৯৭১। মোহাম্মদপুরে বিকেল থেকেই মানুষ জবাই শুরু হয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় বাংলাভাষী সেখানে সংখ্যায় অল্প, সুতরাং হামলার প্রশ্ন ওঠে না। অদূরদর্শী রিফিউজী ভায়েরা শাসকদের শঠতামণ্ডিত দণ্ড সেদিন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল, রাত্রির অন্ধকারের অপেক্ষা করেনি।

অভিশপ্ত মহাম্মদপুর।

এখানে মিলিটারী বনাম বেসামরিক লড়াই হয়নি। সাধারণ মানুষ সাধারণ নাগরিকের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। আরো করুণ পরিহাস, মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমান এবং পাকিস্তানে—যে-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আল্লার উপর ন্যস্ত।

অতীতের স্মৃতি ভুলে যাওয়া উচিত। কারণ, উন্মাদ ব্যক্তিরা কী করে, তা বিবেচনা-বহির্ভূত ব্যাপার। বিহারী মুসলমান ভাইদের আচরণ গড়-পড়তা দেখা উচিত নয়। কারণ, সকলে ত পাগল হয়ে যায়নি। বহু নিরীহ, ধর্মভীরু, অবাঙ্গালী ভাই-বোন সেদিন হাহুতাশ ফেলেছে নীরবে, চরম অসহায়তার মুখে থোয়ার।

আজ কল্পনার ব্যাপার। ফল আজ জানা, প্রক্রিয়ার খবর কেউ দিতে পারে না।

কী শান্ত রং, মমতার উৎস সেই ফর্সা আদল! আরো শান্ত দুই চোখ মেলে যখন সে আদাব দিতে হাত তুলত, দুনিয়ার তাবৎ সারল্য ফুটে উঠত তার মুখে।

মেহেরুন্নিসা আজ আমাদের কাছে স্মৃতিমাত্র।

উদীয়মান তরুণী কবি। এই ছিল ঢাকার সাহিত্যিক মহলে তার পরিচয়। আশ্চর্য গীতিময়তা ছিল তার ভাষায়। কিন্তু যৌবনেই জীবন তার কাছে আদৌ সুরা রূপে ধরা দেয়নি। বাবা অথর্ব হয়ে গিয়েছিলেন বয়সের ভারে। সংসারের প্রধান উপার্জনকারীর এই দশা। পিতার প্রতিনিধি হয়ে উঠল কন্যা। মেহেরুন্নিসা-কে চাকরি নিতে হয়েছিল। টানাটানি, জোড়াতালির সংসারে সে-ই কান্ডারী। তার কাব্য-সাধনার এমন পরিবেশ। দৈনন্দিনতার সঙ্গে লড়াই। অথচ মেহেরুন্নিসার মুখে অভিযোগ

বা ক্লিষ্টতার ছাপ কেউ কোনদিন দেখেনি। তার কবিতা ছিল শান্ত সুরের, তার মুখাবয়বের প্রতিভাস যেন। সংসারের জন্যে মেহেরুন্নিসা বিয়ে করেনি। পরের ঘরণী হলে বাপ-ভাইয়ের দশা কি হবে? মেহেরুন্নিসার কবিতা লেখা আর হলো না, ঘরণী হওয়ার সাধ চিরতরে হারিয়ে গেল সেই কাল-রাত্রির বুকে। গোটা পরিবার বর্বতার শিকার।

কল্পনার দৌড় স্তব্ধ হয়ে থাক। ওই পথে কী লাভ?

কবি-হৃদয় জল্লাদের ছোরার মুখে সমর্পিত। মেহরুন্নিসার আর্তনাদ নৈশ অন্ধকারে বিনা ফরিয়াদেই বুক থেকে উৎসারিত হয়েছিল বৈকি। সামাজিক শক্তি—সোশ্যাল ফোর্স যখন গতি-মুখর হয়ে ওঠে, তখন তার সামনে স্নেহ মায়া মমতা ও অন্যান্য মানবিক আদলের কোন মূল্য থাকে না, তা প্রাকৃতিক শক্তির মতো এগোয়। যেমন ঝড়, বন্যা ভূমিকম্প জাতীয় আর কিছু। নির্বিকার এক গতি। সেখানে যুক্তি বিচারের কোন মূল্য থাকে না। মহাম্মদপুর এমনই এক এলাকায় পরিণত হয়েছিল। সেখানে মানুষ অবান্তর। যারা মানুষ বা দেশের নাগরিক রূপে পরিচয় দিতে পারত, তারাও স্তব্ধ শিলায় পরিণত হয়েছিল।

কেন এমন হয়?

এক যুগ পর এমন প্রশ্নের কী কোন সার্থকতা আছে? মেহেরুন্নিসা আর ফিরে আসবে না। যথার্থ জবাব। তবু, জিজ্ঞাসা দরকার যেন এই দেশে অন্ধ সামাজিক শক্তির আর অভ্যুদয় না ঘটে। পৃথিবী বদলাতে সামাজিক শক্তির দরকার। তা-ছাড়া মানব সভ্যতা এগোয় না। কিন্তু সেই সামাজিক শক্তি—সোশ্যাল ফোর্স হবে মানুষ কর্তৃক সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত।

পঞ্চাশ বছর পূর্বে কী, তারও আগে থেকে ধীরে ধীরে বর্ণবিদ্বেষের—হিন্দু মুসলমান, বাঙালী বিহারী, পাঠান পাঞ্জাবী ইত্যাদি বিভেদের রেখা রাজনীতির আঁচল ধরে ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছিল। নচেৎ তা সামাজিক এমন তান্ডবে পরিণত হোতে পারত না। একই বর্ণ, একই দেশের দুই লোক। তারা দেখতে কী এক রকম হয়? এক মায়ের পেটের দুই ভাই দেখতে এক রকম হয় না। এমন তুচ্ছ ব্যাপার কী এক এক জন-কে অমানুষ বর্বর তোলে? না। তাহলে উৎস খুঁজে বের করতে হয়। প্রত্যেকের সেই দিকে চোখ ফেরানো উচিত, যেন পৃথিবীতে এসে এবং মনুষ্য-সমাজে জন্মে আমরা জানোয়ার ব'নে না যাই। ভবিষ্যতে সকল সামাজিক শক্তির নিয়ন্ত্রক হবে মানুষ এবং তার একমাত্র দিশারী ও গন্তব্যস্থল ঃ মানব-কল্যাণ।

আদিম যাযাবর কাল শেষ হওয়ার পরই মানুষ কোন এক এলাকার মানুষ ব'নে যায়। কৃষি-যুগের পত্তন তখনই। পূর্বেই উৎপাদনের

হাতিয়ার তা-কে উদ্ভাবন করতে হয়েছে। পাথরের হাতিয়ারের নানা রকম বিবর্তন। বর্তমানে তা সাক্ষ্য-স্বরূপ যাদুঘরে দেখা যায়। কৃষি-যুগে উৎপাদন হাতিয়ার আরো উন্নত। লোহার ব্যবহার চাকা, লাঙল এমনতর নানা উদ্ভাবন মানুষকে প্রকৃতি-বিজয়ে সাহায্য করেছে। এই সব হাতিয়ার সে নিজেই ব্যবহারে পটু। তখন থেকেই মালিকানা বোধ তার কাছে সহজাত। এই সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভয়—যেন কেউ তার জিনিষটা না ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এখন বলা যায়, সম্পত্তিই তার ভয়ের উৎস। আর তা থেকে যুগেযুগে উৎপাদনের হাতিয়ারের উন্নতি এবং তদনুযায়ী গঠিত সামাজিক কাঠামো ও তার পরিবর্তন-মাফিক, মানুষ দল বেঁধেছে। কখনও সে কৌম (ট্রাইব) কখনও সে সম্প্রদায়, কখনও জাতি। তার বর্ণবাদের উৎসও এইখানে নিহিত। তার আসল লক্ষ্য সম্পদ রক্ষা। শুধু ভয় ত সম্পদ হেফাজতে রাখে না। ভয়ের জন্য আরো উপায় খুঁজতে হয়। তখন মানুষ দল বাঁধে। কখনও সে অমুক ধর্মীয় সম্প্রদায়, কখনও অমুক দেশের মানুষ বা জাতি। এই আইডেনটিটি, বাঙলা তর্জমায়—স্বাজাত্য-সন্ধান তার কাছে অবধারিত হয়ে পড়ে। অনেক সময় তা-ই দেখা যায়, হয়ত অর্থনৈতিক বিরোধ তেমন নেই; কিন্তু তবু স্থানীয় মানসিক আবহাওয়ায় মিলেমিশে যেতে অক্ষম। তার কারণ স্বাজাত্য-বোধ। হয়ত ভাষা, নয় সংস্কৃতি বা বিশ্বাস সে বা তারা ছাড়তে পারে না। তখন যে দল শক্তিশালী তারা দুর্বল দলকে অধীন করে রাখে, শোষণ করে আবার কখনও কখনও একদম নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। দেখা যায়, শোষিত সংখ্যালঘিষ্ট দল নিজেদের স্বাজাত্য আঁকড়ে থাকে। তখন মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয় ঃ আমরা এবং ওরা। সাধারণতঃ, মানুষের আসল বিচার তার গুণ দ্বারা। কিন্তু সেদিকে আর কারো চোখ থাকে না। পূর্বে উল্লেখিত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে আছে কোন অমুসলমান দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারবে না। একদম বে-আইনী। পাকিস্তানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায় আছে। যদি নানা গুন-বিশিষ্ট কোন অ-মুসলমান পাওয়া যায়. তার ত প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয় না। কারণ, পাকিস্তান হয়েছিল ভারতের মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ট বা মাইনরিটির আন্দোলনে। পাকিস্তান সৃষ্টির পরও কিন্তু স্বাজাত্যের কোন নড়চড় হোল না। কারণ ভয়। আর মনে রাখা দরকার, স্বাজাত্য কোন যুক্তির উপর গড়ে ওঠে না। একই এলাকা একই অর্থনৈতিক স্বার্থ অবিশ্যি স্বাজাত্যের উপাদান। কিন্তু এক ধরনের চাল-চলন, আদব-কায়দা, ক্রিয়াচার, পালা-পার্বন বিশেষ ভাবে গণ্য। এ-সব ত পুরুষানুক্রমে চলে আসে। তার সত্য-মিথ্যে নিয়ে কেউ তর্ক বা যুক্তির ধার ধারে

না। পিতামহ পুত্রকে ঐতিহ্য দিয়ে গেছে। পুত্র তার প্রপৌত্র কে। অতীত এখানে মহানায়ক। বহু প্রাচীন চাল-চলন বর্তমানে খাপ খায় না, তবু সমাজে টিকে থাকে। কারণ, সুদূর অতীত থেকে চালু এই সব রেওয়াজ সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তোলে না। দেখা যায়, বিশ্বাস, যুক্তি তর্কাতীত এক ধরনের মানসিক বিলাস। তার উপর' যদি কোন সমাজ অনিশ্চয়তা এবং ক্ষুধার ভয়ে ভীত থাকে, তখন যে-কোন যুক্তি-বিচার-হীন বিশ্বাস মানুষ আঁকড়ে ধরে। অনিশ্চয়তার মুখে নিরাপত্তা বড় হয়ে দেখা দেয়। তখন যে-কোন বিশ্বাস তা যতই অযৌক্তিক হোক না, সমাজের আবেগের প্রয়োজন অন্ততঃ মেটায়। একটা দল, সম্প্রদায়, জাতি—এই জাতীয় গোষ্ঠী-মনোভাব আরো দৃঢ় করে। এই পর্যায়ে আসে, মগজ-ধোলায়ের ব্যবস্থা। সমাজে কচি-কচি বাচ্চা, কিশোর তার শিকার হয়ে পড়ে। শিক্ষাদীক্ষা সেই রকম ছাঁচে ঢালা হয়। যদি কোন গোষ্ঠির বিশ্বাস জন্মে যে, নেতৃত্ব-দানের তাদের অধিকার আছে এবং তারাই শুধু সাচ্চা গোষ্ঠি—এমন দলের সামরিক ও সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কারণ, সদ্য-সম্মুখীন সমস্যার সমাধান তারাই দিতে পারে সাহস ত্যাগ, ইত্যাদি মারফৎ। এই জন্যে দেখা যায় দেশে জরুরী অবস্থায় যারা সফল, সাধারণ শান্তিপূর্ণ সামাজিক আবহাওয়ায় তারা তেমন কার্যকর নয়। এমন কি সামাজিক উন্নয়ন পরবর্তী পদক্ষেপে সাধারণতঃ তারা আর এগোতে অক্ষম, বরং ক্ষতিই ডেকে আনে নানা রকম।

কোন দল, সম্প্রদায় জাতি ইত্যাদি যত নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করে, তাদের বিশ্বাসের উপর নির্ভরতা তত বেড়ে যায়। অন্য দলের বিশ্বাস থেকে তাদের বিশ্বাস যতই দূর ও পৃথক—ততই তারা জোর দেবে নিজেদের বিশ্বাসের উপর, আনুগত্য স্থাপনের জন্যে নিজের দলের লোককে।

মোদ্দা কথা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ঘটলে, তখন এমন সব অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটে। মানুষ যুক্তি-বিচার ক্ষমতার জন্যেই প্রাণী জগৎ থেকে আলাদা। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, অবস্থার বিপর্যয়ে তারা যক্তিবিচার হারিয়ে ফেলে। আজও তাই শিয়া-সুন্নী লড়াই করে এবং মরে বা মারে এবং পবিত্র ইসলামের দোহাই মেরে।

মোহাম্মদপুরের ছিন্নমূল ভাইয়েরা এসেছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে পাকিস্তানের ডাকে। কিন্তু তারা নতুন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। সকল মুসলমানদের নিরাপত্তার আশ্রয়-স্থল হবে পাকিস্তান! কিন্তু তা হোল না। মিথ্যে মরিচীকা সৃষ্টি করেছিল মুসলমান মধ্যবিত্তের দল—যারা ভারতে উন্নততর হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে

প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছিল না, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে। তাই আহ্বান ঃ মুসলমানের পাকিস্তান। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের (অর্থাৎ, মধ্যবিত্তের) পাকিস্তান। কালে কালে তাই দেখা গেল, সাধারণ নির্বিত্ত মুসলমানের অস্তিত্বের লড়াই আর থামল না। যারা ভাই রূপে ডাক দিয়েছিল তারা বোহনাই (ভগ্নিপতি) সেজে সবই গ্রাস করতে লাগল।

মোহাম্মদপুরের অবাঙালী ভাইয়েরা শিকড় খুইয়ে এসেছিলেন। তাই নিরাপত্তার অভাবে শাসকশ্রেণীর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লেন গোড়া থেকেই। ভাষা ও অন্যান্য বিভেদ সেই প্রবণতার সহায়ক হয়ে ওঠে মাত্র।

ন্যায়, অন্যায়, অপরাধ নির্দোষিতা এই সব প্রশ্ন তাই আজ অবান্তর। ঝুটা সোশ্যাল ফোর্সের শিকার মানুষ কী ভাবে হয়ে পড়ে, তাই আজ লক্ষ্য করা উচিত যেন ভবিষ্যতে মানুষকে মানুষের মর্যাদা আমরা দিতে পারি এবং মানবিক মর্যাদা থেকে ধুলোয় না লুটিয়ে পড়ি। যেন বিহারী ভাইদের অযথা ঘৃণা না করি। সম্প্রদায়, বর্ণ, ধর্ম—এসবের আড়ালেই বর্তমানে শোষকেরা, শাসকেরা আত্মগোপন করে থাকে। উদ্দেশ্য, মতলব-সিদ্ধি।

"দাদু আপনে কইতেন, মসিবত আইলে আজান দেওয়া উচিত। আজান দিলে মসিবৎ দূর হয়। আজান দিমু?"

"চুপ, চুপ। জোরে রাও করিস না।" ঢাকা শহরের নয়া বাজার এলাকা মধ্যবিত্ত গেরস্থর ঘরদোর, দোকান-পাটে বোঝাই। দিনের বেলা মানুষ গিঞ্জগিজ করে। ভিড় হরদম লেগেই থাকে। সেদিন রাত্রে দুপুরের অক্তে মনে হচ্ছিল কোন বিরান এলাকা। এখানে কোন এক কালে মানুষ বাস করত। আজ অদৃশ্য যাদু-দণ্ডের স্পর্শে সবাই পাথর হয়ে গেছে অথবা ঘুমিয়ে আছে।

কিন্তু মিথ্যে কথা। কিছুই পাথর হয়ে যায়নি, কেউ ঘুমায়নি।

এক কিশোর বালক থাকত কাঠগোলার পাশে একটা উঠানের পাশে ছোট বাসায়। বাসা মানে নিজেদের মেহনতে তৈরী খুপ্‌রী ঘর। পিতামহের নিকট মানুষ কিশোর ছেলেবেলায় বাপ মা দুই মারা গেছে। দাদু কাঠগোলায় চাকরী করত। কাঠ চেরাই-ফাড়ায়ের পর গাড়ীতে বোঝাই দেওয়া, মহাজনের ফাই-ফরমাস শোনা বা ওই জাতীয় কাজ। নাতি নিকটস্থ আর একটি পাশের কাঠ-গোলার ফরমাস খাটত। দাদুর রোজগারে কিছু টাকা সাহায্য। নচেৎ দশ বিশ টাকায় আর কী এমন সাহায্য

হয়। সেদিন রাত্রে দুই জনে নিজেদের ডেরায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। সারাদিনের খাটুনির পর বৃদ্ধ-কিশোর দু'জনেই ক্লান্ত হয়ে থাকে। হঠাৎ গুলি গোলার আওয়াজে দু'জনেরই ঘুম আচমকা ভেঙে যায়। সারা দিনে শহরে গুজবের অন্ত ছিল না। দাদু-নাতি দু'জনের কানে পড়েছিল বৈকি সব কথা। কিন্তু তারা আমল দেয়নি তেমন। শহর ব'লে কথা। এখানে নদীর মত জোয়ার ভাটার ঢেউ ত কম নয়। কিন্তু মাঝ-রাতের বিকট-বিকট শব্দ ঘুম ভাঙায়নি শুধু, তাদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল।

কাছাকাছি মিলিটারী গাড়ী যাতায়াতের শব্দ। বৃদ্ধ একবার সাহসের উপর নির্ভর করে, খুপরির বাইরে এসেছিলেন। কিন্তু চারিদিকে থমথমে ভাব দেখে আবার বিছানার আশ্রয়ে ফিরে যান। নাতি তখন বিপদ-উত্তরণের পন্থা উদ্ভাবন করেছিল। দাদু তাকে নিরস্ত করতে চায় কেন?

"দাদু, আজান দিমু। হে ত খারাপ কাম না। আপনে চুপ করতে বলেন ক্যান?"

"আওয়াজ শুইনলে মিলিটারী আইয়া পড়ব। আন্দাজ পাবো এহানে মানুষ আছে।"

"ত আমাগো মাইরব ক্যান? আমরা ত কিছু করি না।"

"হে তুই বুঝবি না। অহন আজান দিলে ত হেরা জাইন্যা যাইবে এহানে মানুষ আছে।"

ফিস্‌ফিস স্বরে দুই জনের সংলাপ। আতঙ্কের জের শিরায় শিরায় প্রবাহিত।

কিশোর প্রতিবাদ জানায় তবু, "আজান দিমু, তয়, কসুর কী?"

বৃদ্ধ পিতামহ মনে মনে বিরক্ত হন। অবোধ বালককে কী ভাবে তিনি বুঝ দেবেন?

কিন্তু তাদের বেশী অপেক্ষা করতে হয় না। হঠাৎ ফ্লোরিসিন বোমায় চতুর্দিক আলোকিত হয়ে ওঠে। তারপর ফ্লেম থ্রোয়ার (অগ্নি-নিক্ষেপক) বোমা কাঠগোলার উপর এসে পড়ে। দু'তিন মিনিটের মধ্যে আগুন লেগে যায় চতুর্দিকে।

দাবানল শুরু হয় জংগলে। সেখানে কাঁচা শুকনা সব রকমের কাঠই পোড়ে। এখানে শহরে শুক্‌না কাঠে আগুন লাগে। কাঠগোলার কিছু কুলী-কামীন ছিল। তারা দিশাহারা এদিক ওদিক প্রাণরক্ষায় আত্মগোপনে চেষ্টা পায়। কিন্তু শহর ত জংগল নয়। এখানে কাঁচা কাঠ থাকে না গোলায়। মানুষই একমাত্র কাঁচা কাঠের বদলি হয়ে দাঁড়ায়। এক সময় দাদু এবং নাতি হতভম্ব দৌড়াদৌড়ির ফলে আগুনের শিখার নিকট এসে

পড়েছিল। আর ফিরে পালানোর উপায় ছিল না। চতুর্দিকে সর্বগ্রাসী রাক্ষসীর জিভ অতিদ্রুত প্রসারিত।

সদর-ঘাট, টার্মিনালে ত দিনরাত্রি বলে কিছু নেই। সেখানে মনে করলে চব্বিশ ঘন্টাই দিন অথবা চব্বিশ ঘন্টাই রাত্রি। সাধারণতঃ রাতের সঙ্গে প্রধানত দুটি ব্যাপার জড়িয়ে থাকে ঃ ঘুম-বিশ্রাম এবং অন্ধকার। দিনের প্রকাশ কর্মব্যস্ততায়, নানা রকমের চাঞ্চল্যে এবং আলোর প্রবাহে। এই সব দিক থেকে সদরঘাট টার্মিনাল দিবারাত্রিহীন। এখানে হাজার শব্দ এবং কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে বেশ কিছু লোক ঘুমিয়ে থাকে। হয়ত লঞ্চ ফেল করেছে, আবার পাঁচ ঘন্টা পরে পরবর্তী লঞ্চ। এমন বহু লোক এখানে এক পাশে ঘুমন্ত থাকে। প্রলয় হয়ে গেলেও তাঁদের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটবে না। কিছু ভিখিরী ঘুমায়। কেউ শুয়ে শুয়ে ভিক্ষে চায়। পশারী দোকানদারের ঘুপ্‌চি দোকানে আদিম কালের অন্ধকার জমে আছে। বর্তমান যুগের নিওন-লাইট সেখানে পৌঁছাবে না কোনদিন। সদরঘাট জুড়ে নানা স্ববিরোধ ব্যাপারের সহ-অবস্থান সব সময় চোখে পড়বে।

পঁচিশে মার্চ নতুন কোন ব্যতিক্রম দিন ছিল না। সদর ঘাটের পটে নানা রকমের চলমান ছবি সব সময় উদয়-অস্তের খেলায় মত্ত। কিন্তু সেদিন রাত্রি দশটার সময় হঠাৎ থিতিয়ে যাওয়ার জোয়ার এলো যেন। 'শহরে আজ গোলমাল হবে।' এই গুজবে অনেকে কান দিয়েছে আবার অনেকে দেয়নি। তবে স্তিমিত হয়ে আসছিল সব কর্মপ্রবাহ।

রাত-দুপুরে শহরে গোলাগুলির আওয়াজ এই এলাকায় এসে পৌঁছিল। সদরঘাট জুড়ে বহু লোক শুয়ে থাকে। লঞ্চের যাত্রীরা অধিকাংশ এই বিশ্রামার্থীদের মধ্যে গণা যায়। আবার অনেক ভিখিরি আছে, যারা সারাদিন অন্য কোন রাস্তা বা এলাকায় রোজগারের ধান্দায় গেলেও সদরঘাটে ফিরে আসে। তা জায়গার মায়া অথবা অন্য কোন সুখসুবিধার হাতছানি, বলা দায়।

কয়েকটা গ্রীনবোটে এতক্ষন স্ফুর্তির হররা চলছিল। ঘুঙুরের আওয়াজ থেকে আন্দাজ করা যেত! আর গান ছিল সঙ্গে। সুতরাং অনুমানে কোন ব্যত্যয় ঘটার কথা নয়। দেখা গেল, গ্রীনবোটগুলো হঠাৎ নোঙ্গর তুলে আরো দূরে সরে গেল।

শব্দের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে লাগল। আতঙ্কের ভ্রূকুটী এমনই সর্বচর হয়।

আন্দাজ রাত্রি পৌনে দুটো হবে। একটা 'আরমার্ড কার' সদরঘাটের

ভেতর ঢুকে এলোপাতাড়ি ফায়ার করতে লাগল। যারা সব আতঙ্ক-মুক্ত হতে নিজের বন্ধ চোখের উপর নির্ভর করেছিল, তাদের চোখ বন্ধ হয়ে গেল না চিরতরে শুধু, তাদের চোখের হদিস আর কেউ দিতে পারত না। আগুনের স্পর্শ সব কিছু বিকৃত অথবা ছাই করে ছাড়ে। তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

বুড়িগঙ্গা নদীর উপর কয়েকটা নৌকায় আগুন লেগে গিয়েছিল। অন্ধকার নদীর বুক এমন তীব্র আলোর জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। মাঝি-মাল্লাদের অবস্থা কল্পনা করা যায়। সরাসরি গুলির মুখে যারা পড়েছিল, তাদের আর কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না আত্মরক্ষার জন্যে। দিশাহারা জীবিতদের দল নদীর জলের সঙ্গে অন্য পাড়ে উঠেছিল। এমন দুর্বিপাকের শত শত ছবি হঠাৎ সেদিন আঁকা হতে থাকে জলের উপর। আর ডাঙ্গার কাহিনী আরো ব্যাপক। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তার সব হদিস কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। কারণ, একটি মানব-মানবী স্বয়ংসম্পূর্ণ নিজের মধ্যে আবদ্ধ জীব, এমন অপবাদ কে দিতে পারে? সকলেই কলাগাছের শিকড়ের মত একে অপরের সঙ্গে জটীল নকশায় জড়িত। একটা মানব বা মানবী অর্থ সমাজ-সংসারের হাজার হাজার বন্ধন। দয়া-মায়া, স্নেহ মমতা, লোভ-লালসা, হিংসা প্রীতি, এমন বহুধা খেই সব পাকে পাকে বেঁধে রাখে। এমন কী যে ব্যক্তি উন্মাদ তারও মনোজগৎ ফাঁকা নয়। সচেতনভাবে হয়ত ধায় না, হয়ত জানান দিয়ে এগোয় না, তবু তার প্রবাহ বইতে থাকে এবং কারো তোয়াক্কা না রেখেই।

শহীদুল্লা সাবেরের নাম আজ অনেকে ভুলে যেতে পারে। কিন্তু ভুলে যাওয়া অপরাধ। ইতিহাসে সব সময় বড় দিকগুলো মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ছোট, ছোট আরো দিকশূল থাকে, তা-ও পথের হদিস, পথের বার্তাবাহী। এই কথাটুকু কারো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। শহীদুল্লা সাবের বাংলাদেশের সেই টগবগ ফুটন্ত যৌবনধারী তরুণ, স্বদেশের দুঃখ যার বুকে অহর্নিশ দাবানল জ্বালিয়েছিল। স্বদেশের দুঃখ অর্থাৎ মানুষের দুঃখ। কী ভাবে এদেশের অধিকাংশ মানুষ দিন গুজরান করে? জন্তুর মত শুধু নিজের ও পরিবারের পেটের সাধারণ দু মুঠো ভাতের যোগাড় করতেই অনেকে প্রানান্ত। মানুষ হওয়ার জন্যে ত আরো কিছু লাগে। শিক্ষা দীক্ষা, চিন্তার সময়, শরীর-উপযোগী বিশ্রাম এমন নানাতর উপাদান। তার সামান্যতম অংশ কোটি কোটি মানব-মানবীর কাছে স্বপ্ন মাত্র। ফলে, অতি সামান্য চৌহদ্দীর মধ্যে তারা দিনাতিপাত করে মনুষ্যেতর আচরণেঃ ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে কাইজ্যা, আগোষে রেশারেশি, বাঁচার জন্যে ছোট-খাট লোভের শিকার,

কখনও অস্তিত্বের সব ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্যে উন্মত্ত হিংস্রতার অনুসরণ। মানব-জীবনের বিরাট প্রান্তর তাদের চোখে আর ধরা দেয় না। এই সামাজিক চিত্র-নির্মাণের পেছনে ক্রিয়াশীল শিল্পী এক বিকট-কায় রাক্ষস—তার নাম শোষণ। শোষণই মানবতার অবমাননার আসল উৎস।

শহীদুল্লা সাবেরের বুকে এই হদিস আশ্রয় পেয়েছিল। বুক আর তখন বুক রইল না। বুক হলো অগ্নিগিরি। অগ্নিগিরি কখনও কখনও স্তব্ধ থাকে। বাইরে থেকে তা সত্য। কিন্তু ভেতরে তার বিশ্রাম নেই। সেখানে নিত্য-নিয়ত ফুটন্ত লাভা-স্রোত বিশ্রামহীন। শহীদুল্লা সাবের রাক্ষসের মোকাবিলায় তাল ঠুকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ডুয়েল লড়তে। দ্বৈরথ সমর। অনেক নির্যাতন দেহের উপর, অনেক কশাঘাত মনের উপর। মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতন্ত্রীগুলো ছিঁড়ে যাওয়ার কথা। পাকিস্তান সরকারের জেলের ভেতর আবদ্ধ অগ্নিগিরি একদিন বেরিয়ে এলো। স্তব্ধ। বুকের অগ্নিকুণ্ড স্তব্ধতা দিয়ে ঢেকে রাখার কৌশল, হয়ত সাময়িক-ভাবে গ্রহণ করেছিল শহীদুল্লা সাবের। অগ্নিগিরির অন্তর্যাত্রা শুরু হয়। যাযাবর শহীদুল্লা সাবের। ঢাকা নগরীর আকাশ ও বাসগৃহ তার কাছে আর কোন পার্থক্য-সহ ধরা পড়ল না। গোটা বাঙলাদেশকে যে মনুষ্য-বাসোপযোগী গৃহ বানিয়ে ফেলার স্বপ্ন দেখত, তার নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। ইদানীং শহীদুল্লা সাবের সংবাদ-পত্রিকার অফিসে ফিরে আসত শুধু রাত্রিবাসের জন্য। এই পত্রিকা সমাজের মতই বিবর্তনের ধারায় এগিয়েছে ক্রমশঃ ভবিষ্যতের দিকে। ছিল মুসলিম লীগের মুখপত্র। তা হয়ে পড়ল, হাত-বদল নয় কাল-বদলও বলা চলে, দ্বিজাতি-তত্ব ঝেড়েমুছে ফেলে দিয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদের জয়ডঙ্কা। সাবেরের চোখ ছিল ভবিষ্যতের দিকে সদা সর্বদা। তাই কী জীবনের এই প্রান্তে সংবাদ পত্রিকার আশ্রয়ে সে মানসিক প্রশস্তি খুঁজে পেত? মর্তের শরীরের জন্যে বিশ্রাম ব্যতীত উপায় থাকে না। তাই কী সদা-জাগ্রত অগ্নিগিরি এমন জায়গায় কিছু স্তব্ধতা খুঁজেছিল? আমরা আজ কেউ তার সঠিক জবাব কোনদিন খুঁজে পাব না। তাই অনুমান বন্ধ থাক।

সেদিন পঁচিশের রাত্রে শহীদুল্লা সাহেবের সংবাদ-পত্রিকার অফিসের ইদানীং অভ্যাসের ধারায় এসে ঠাঁই নিয়েছিল। গভীর রাত্রে মর্টারের শেল দাগা শুরু হয় সংবাদ-পত্রিকার অফিসে। বাঙালী জাতীয়তাবাদী সংগীত যে-কন্ঠ থেকে প্রতিদিন উৎসারিত হয়, তার গ্রীবানালী চেপে ধরো, মাথা উড়িয়ে দাও। পাকিস্তানী হানাদারেরা হিসাবে বিন্দুমাত্র ভুল করেনি। তাদের আক্রোশ স্বাভাবিক। শহীদুল্লা সাবের গল্প লিখেছে বেশ

কিছুদিন ধরে। বিরাট সম্ভাবনাময় ছিল তার সাহিত্য-সাধনা। মর্টারের কর্ণভেদী শব্দে সে কী বিরল-সুখ মুহূর্তের আঘাতগুলো শুনতে পেয়েছিল ? দেওয়াল ধ্বসে পড়ছে, কোথাও ইট রাবিশ-ধুলোর মত উড়ছে, কোথায় শেডের টীন ছিন্নভিন্ন হাজার ক্রেঙকারে ক্রেঙকারে দিগ্বিদিক ছিটিয়ে চলেছে। আগুন আর হল্কা। শহীদুল্লা সাবেরের ত হতচকিত হওয়ার কথা নয়। সে নিজেই অগ্নিপিণ্ড।

কী হয়েছিল কাল-রাত্রির সেই পটে একটি আত্মাকে ঘিরে, তা এখন কল্পনার অনুষঙ্গী। পরিণাম-টুকু শুধু আমাদের জানা। ইটপাটকেল ইস্পাত-লোহা আর ভস্মস্তুপের তলায় সমাহিত, শহীদ হয়েছিল অনির্বাণ এক তরুণ, যার নামের সার্থকতা সে নড়চড় হতে দেয়নি। 'সাবের' মানে ধৈর্যশীল, যে সবুর করতে পারে ? পাকিস্তান হওয়ার পর থেকেই শোষণের নিগড়-মুক্ত হওয়ার জন্যে সে প্রতিজ্ঞা করত বৈকি স্বাধীনতার স্বপ্নে। আজ এই ভুখণ্ড স্বাধীনও হয়েছে। সাবের (ধৈর্যশীল) শহীদদের অমর আসনে প্রতিষ্ঠিত। দেশবাসীর সুখ-দুঃখের স্পন্দনই ছিল যার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, তাদেরই হাজার লক্ষের মৃত্যুর সঙ্গে শহীদুল্লা সেই রাত্রে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিল।

এমন মহান মৃত্যুর মুহূর্ত ত প্রতিদিন আসে না।

পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল সংখ্যালঘিষ্ট বা মাইনরিটি আন্দোলন রূপে। পাকিস্তান হওয়ার পর দেখা গেল, সমস্যা মিটিল না। আবার নতুন মাইনরিটি দেখা দিয়েছে। পূর্বে মুসলিম লীগ নেতাদের মতে হিন্দু সম্প্রদায় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থাৎ মেজরিটি এবং মুসলমানেরা মাইনরিটি। এবার মুসলমানদের মধ্যে আবার মাইনরিটি বেরিয়ে পড়ল। একদম অযৌক্তিক বা অপ্রত্যাশিত নয় এই ঘটনা।

তবে মুসলিম লীগ নেতাদের কানা চোখে তা ধরা পড়েনি। দেখা গেল, ভারতের অন্য প্রদেশ-আগত মুসলমানেরা রিফিউজী হয়ে এলো। তারা নতুন পরিবেশে মিশে যেতে অক্ষম। এই অক্ষমতা ইচ্ছাপ্রসূত নয়। সুতরাং ভারত-আগত মুসলমানদের কোন দোষ কেউ দিতে পারে না। যুগযুগান্তের মানসিক অভ্যাস কী রাতারাতি বদলে ফেলা যায় ? ছেলেবেলা থেকে যারা রুটী খেতে অভ্যস্ত, তাদের যদি ভাত খেতে বলা হয়, তা ক্ষুধার চোটে হয়ত কেউ খেতেও পারে, কিন্তু মন সায় দেবে না। অর্থাৎ, আহারে পরিতৃপ্তি গায়েব! আহারও, ধরে নেওয়া যায়, অভ্যাসের ব্যাপার। প্রথমে খারাপ লাগলেও তা ধীরে ধীরে রপ্ত হয়ে যায়, বদলে যায় অভ্যাস।

এখন বাংলাদেশে বহু মানুষ অন্ততঃ এক বেলা রুটি খায়। তা নিয়ে আর কেউ উচ্চবাচ্য করে না। যেহেতু চালের অভাব দেশে, বরং গম পাওয়া যায়; মানুষ রুটি মেনে নিয়েছে। কিন্তু যা চিরাচরিত, ঐতিহ্য-গত মানসিক ব্যাপার, তা অত সহজে গ্রহণ করা দুঃসাধ্য। রাতারাতি নিজের ভাষা ছেড়ে কী পরদিন থেকে অন্য ভাষায় আপনি কথা বলতে পারবেন ? মনের অভ্যাস অত সহজে বদলানো যায় না। আদব-কায়দা, চালচলন, সামাজিক উৎসব এমনতর নানা মানসিক প্রকাশ প্রায় অনড় পাথর হয়ে মানুষের আত্মার ভিতর বসে থাকে। পরিবেশ বাদ দেওয়া চলে না। এক বিহারী মুসলমান, যিনি রুক্ষ প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় মানুষ তার পক্ষে পূর্ববাঙলার গাছপালায় সবুজ, নদীখাল-বেষ্টিত এবং বৃষ্টিমুখর স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ মনে হবে একদম অচেনা। এমন অবস্থায় মনের সঙ্গে তাল রাখা কষ্টকর। তখন মানুষ নিজের কাছেও হয়ে পড়ে অচেনা। সে যেন খড়কুটো যা বানে, জোয়ারের জলে ভেসে বেড়ায়। এমন লোকের পক্ষে কোন জায়গায় শিকড় পোঁতা কঠিন।

ঠিক এমনই ব্যাপার ঘটেছিল একদা পূর্বপাকিস্তানে।

অবিশ্যি মনে রাখা দরকার, সব রকম মানসিক এবং প্রাকৃতিক বাধা ধীরে ধীরে কাটিয়ে ওঠা যেত। কিন্তু মুসলিম লীগ নেতাগণ গোড়া থেকেই চোর বাটপাড় দস্যুদের হুজুর কেব্‌লা বা রক্ষক প্রভু সেজে বসল। গরীবদের আরো গরীব করার নীতিগ্রহণ করেছিল পাকিস্তান-নামক রাষ্ট্র যন্ত্র আইন-কানুন ও নীতি মারফৎ। যেখানে নীতির বালাই নেই, সেখানে অন্য মানুষের দিকে তাকানোর প্রশ্ন গায়েব হয়ে যায়, সামাজিক দায়িত্ব উবে যায়। তেইশ বছর ধরে তা-ই ঘটল। দস্যু বাটপাড়দের মধ্যেও শ্রেণীভেদ থাকে। অতি বিত্তবান এবং অপেক্ষাকৃত কম বিত্তবান। তাদের মধ্যেও নীতিহীনতার ধাক্কা গিয়ে পেঁছায়। তখন যে-যাকে পারে ঠেকিয়ে, গুঁতিয়ে নিজের দিকে ঝোল শুরুয়া টেনে আনে। হালুয়া রুটির ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। ভৌগলিক ভাবে পাকিস্তান দ্বিখন্ড হয়ে জন্মেছিল ঃ পূর্ব এবং পশ্চিম। ধড় দু টুক্‌রো। মাঝখানে বারো শ' মাইল ব্যবধান। তা পূর্ণ করার একমাত্র দাওয়াই ঃ ইসলাম ধর্ম। কিন্তু সে ইসলামের তফ্‌সীর বা ভাষ্য দুরকম। তফ্‌সীরের পেছনে লুকিয়ে আছে স্বার্থ। অর্থাৎ স্বার্থ, লোভ অর্থ-লিপ্সা নিয়ন্ত্রক হয়ে রইল তফ্‌সীর ভাষ্যের। ইতিহাসে এই খেল্‌ একবার অনুষ্ঠিত হয়নি বহুবার হয়েছে। তবু মানুষের চোখ খোলে না। একটা উদাহরণ দিলেই চলে। কারণ, সব তফ্‌সিরের ক্ষেত্রে ওই একই কাহিনী ঃ হালুয়া-রুটির প্রশ্ন। খলিফা হারুনর রশীদের আমলকে অত্যন্ত গৌরবময় অধ্যায়

ধরা হয়। জ্ঞান বিজ্ঞান, ধন-দৌলত ব্যবসাবাণিজ্য, সাহিত্য শিল্প জীবন যাপনের ধারার শান-শওকত অগয়রহ—সেই আমলে নাকি একদম তুঙ্গে উঠেছিল। কিন্তু সেই প্রদীপের তলায় কী অন্ধকার ছিল, অনেকে জানে না। খলিফা হারুনের রশীদের আমলে গ্রামের শোষণ-জেরবার চাষী মজুর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনকে বলা হয়ঃ ইয়াংগী আন্দোলন। এই বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন বহু ধর্মপ্রাণ লোক। তারা হারুনের রশীদ-কে মুসলমানই বলত না। সত্যই ত হারুনের রশীদের ইমারৎ বালাখানা, বাগ-বাগিচার যে ব্যয়বহুল বর্ণনা পাওয়া যায়, তা ইসলামে ত জায়েজ নয়—যখন দেশে ভুখা-নাংগার আর্তনাদ। শেষে তা বিদ্রোহের রূপ পায়। এই ইয়াংগীদের ইমাম ছিল আলাদা। তারা তার পেছনেই নামাজ আদায় করত। হারুনের রশীদের সমর্থক বোজর্গদের তারা বোজর্গই মনে করত না। এগারো বছর ধরে এই বিদ্রোহীরা লড়েছিল; কিন্তু বাদশার বিপুল-সংখ্যক রণবিদ্যায় নিপুন সৈন্যদের বিরুদ্ধে দরিদ্র বিদ্রোহীরা পেরে উঠবে কেন? বিদ্রোহীগণ ইতিহাসে পরাজয়ের কলঙ্ক বহন করে গেছেন, কিন্তু তা ইতিহাসের গৌরবময় পথও বটে।

এই শিক্ষা সহজে কেউ গ্রহণ করে না। মুসলিম লীগের অন্ধ নেতাদের দূরদৃষ্টি ছিল না বললে, ঘোর অত্যুক্তি করা হয় না। তাই গোড়া থেকেই পূর্ব ও পশ্চিম—দুই পাকিস্তানে ধীরে ধীরে বিরোধ এবং সন্দেহের বীজ বেড়ে উঠতে লাগল। আরো মনে রাখা দরকার, পশ্চিমের বাটপাড় দস্যুরা ছিল ধন—দৌলতে অগ্রসর, ব্যবসা, বাণিজ্যে উন্নত। পূর্বপাকিস্তানের অধিবাসী সেই বখতিয়ার খিলজীর আমল থেকে দরিদ্র এবং বহিরাগত শাসিত। ফলে গোলামীর খোঁয়ারি আজও (স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার পরও) কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মানসিক অভ্যাস অত সহজে বদলানো চলে না। এখনও এদেশে বহু লোক আছে যারা লাখ লাখ নরনারী হত্যা মা-বোনের বেইজ্জতি দেখার পরও পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখে। সাহেবের জুতা পেটা খেয়ে যে-গোলামের সকাল সন্ধ্যা পেট ভরত, সে সাহেব বনে গেলেও স্বাভাবিক হতে পারে না। বরং পুরাতন জুতার জন্যে আফশোষ করে। কারণ, তার মা-বোন-তোলা কর্তার খিস্তি শুনেই ত পূর্বে সে আনন্দ পেত। বাঙলা প্রবাদেও আছে "কর্তা কইছে মাগীর ভাই—আনন্দের সীমা নাই।"

মোদ্দা কথা, মুসলিম লীগ নেতা তথা পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কদের অদূরদর্শিতা এবং গণতন্ত্রহীন অমানবিকতার ফলে এই ভূখণ্ডে ছিট্‌কে-পড়া ভারতের নানা প্রদেশ-আগত আমাদের অগণিত ভাই-বোনেরা আবার মাইনরিটি হয়ে পড়ল। আজ তাঁরা বিহার ও অন্যান্য যে-প্রদেশ থেকেই

মোহাজেরর রূপেই এখানে এসে থাকুন, তাঁদের গড়পড়তা লেবেল হয়েছে ঃ বিহারী। জিন্না সাহেবের "মুসলিম হোমল্যাণ্ড" বটে। সব স্বাজাত্য (আইডেনটিটি) মুছে তারা মুসলমান হয়েছিল জিন্না সাহেবের ডাকে। আজ তাঁদের সে আইডেন্টিটিও মুছে গেছে। ইতিহাসের কী পরিহাস। এই তথা-কথিত বিহারীরা যেহেতু মুসলমান এবং যেহেতু শতকরা সংখ্যায় বিরানব্বই এবং রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা বাঙলাদেশের অধিবাসীও মুসলমান, সুতরাং ওই কওমী ভায়েদের প্রতি তাদের কর্তব্য আছে, তা কেউ স্মরণ করে না। বা, স্মরণ করলেও দায়সারা গোছের হালচাল দেখান। দুনিয়ার মুসলমানদের জন্যে দরদ উচ্ছল জামাত-ই-ইসলামী বা অন্যান্য ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোর গত বারো বছরের নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি দেখে, সন্দেহ হয়, সত্যি কী তাঁরা মুসলমান সমাজের কল্যাণ চান? তাহলে তারা সক্রিয় ভাবে এগিয়ে আসেন না কেন? এই ছিন্নমূল মোহাজেরর ভায়েরা বাঙলাদেশ ও পাকিস্তানের অধিবাসীদের অমানুষিকতার অন্তর্দাহী জখমী দাগরূপে বিরাজ করছেন। তাদের মধ্যে যারা বাংলাদেশকে স্বদেশ মনে করেন তাঁদের পূর্ণ নাগরিক মর্যাদাসহ পুনর্বাসন হওয়া উচিত। বাকীদের পাকিস্তান সরকার নৈতিকভাবে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য।

অতীতের কথা বলতে গিয়ে বর্তমানে এসে পড়লাম। বিষম, অস্বাভাবিক কালে তা-ই ঘটে। পাকিস্তানের সৃষ্টিকালে একদা অখণ্ড-মুসলমানেরা চব্বিশ বছরে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছিল। বাঙালী এবং বিহারীতে আবার তারা বিভক্ত পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতি-রূপী চোর-বাটপাড় দস্যুদের ধন-দৌলত রক্ষাকারী ষড়যন্ত্রের মহিমায়।

এ হেন আবহাওয়া। তারই জ্বাজ্বল্যমান বিদারণ কাল ঃ ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সাল। ফোঁড়ার চব্বিশ বছরের জমা পুঁজ সেদিন ফেটে পড়ল।

রাত্রির অন্ধকারে চোর-দস্যুর স্বাধীনতা মেলে। সমাজ-বিরোধী জীবের দল অরাজকতার মধ্যে বিশেষ স্ফূর্তি লাভ করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এই ভূখণ্ডে যারা এসেছিল সকলেই সজ্জন বলা যায় না। স্বাধীনতার সুযোগে বহু গুণ্ডা-শ্রেণীর লোকও নতুন আস্তানার খোঁজে এসেছিল। আমার জানা কলেজের এক অধ্যক্ষ ছিল। সে অবিভক্ত বঙ্গদেশে তের হাজার টাকা কলেজের তহবিল তছরূপ করে। বিভাগীয় তদন্ত চলছিল। চাকরী যেত তার এবং জেল খাটত সে নির্ঘাৎ। পাকিস্তান হওয়ার ফলে যে বেঁচে গেল। সে এদেশে ধোওয়া তুলসী পাতা, একদম বেদাগ শিক্ষাবিদ ব'নে গেল। আর সাধারণ গুণ্ডাদের ত কথাই ছিল না।

তারা আইনের হাত থেকে বাঁচতে পালিয়ে এসেছিল, যা দেশ ভাগ না হলে হয়ত সম্ভব ছিল না।

পঁচিশের রাত্রে বহিরাগত এমন গুণ্ডার দল পাকিস্তানী সেনাদের হামলায় আরো উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তাছাড়া চব্বিশ বছরে সকলের কপাল চমকে ওঠেনি। বহু রিফিউজী কোন রকমে দিন গুজরান করত। হয়ত সুপারিশ তদবীরের ফলে মোহাম্মদপুরে মাথা-গোঁজার জায়গা পেয়ে যায়। লুটপাটও ত রাতারাতি কপাল ফেরানোর পন্হা। তারা সুযোগ ছাড়বে কেন ?

লুটের লোভ শেষ পর্যন্ত হত্যার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

তপ্ত রাজনৈতিক আবহাওয়া। জনমত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বরের কম্পনের সাথে মিশে গিয়েছিল। রিফিউজী ভায়েরা তা সহজভাবে নিতে পারেনি। কারণ, সংখ্যালঘিষ্টের চেতনা সব সময় শাসকশ্রেণীর অনুগ্রহের প্রত্যাশী হয়ে থাকে। মোহাম্মদপুরের অবাঙালী মাইনরিটিগণ তার ব্যতিক্রম ছিল না।

অন্ধকার কী সব কিছু মুছে দিতে পারে ?

মানুষের বুকের স্পন্দন নিজ তালে চলে। সেখানে অনেক অন্ধকার জমা থাকে। কিন্তু তবু শব্দ ওঠে ঘড়ির টিকটিক শব্দের মত। এই অস্পষ্ট নিনাদ অন্ধকারের কোন তোয়াক্কা রাখে না। বরং অজস্র স্মৃতির প্রবাহ দ্রুত পট বদল করে করে এগোয়। তখন মানুষ কখনও হাসে, কখনও কাঁদে। আবার হয়ত বিষাদের তলায় চোখের পানি জমা করে।

ঢাকা শহর পঁচিশে মার্চের রাত্রে শুধু মানুষের চোখের জলে ডুবে যেতে পারত। মাঝে মাঝে আর্তনাদে নিস্তরঙ্গ নিশীথিনীর পাঁজর চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আততায়ীদের কানে তা যায়নি। আর যদি তা হানাদারদের কানে যেত, তা হোত উল্লাসের উৎস।

দুঃখের বয়ান তাই থেমে থাকাই ভাল। কতো অপমৃত্যু ঘটেছে সেই রাত্রে পৃথিবীর আলো-বাতাস চিরতরে বঞ্চনার জিদে, তা কেউ জানে না।

ছবি প্রায় একই রকম। এক বাক্যে সব তালিকা-ভুক্ত করা যায়ঃ বর্বরতা এক দিকে আর অন্য দিকে পাশবিকতার নিষ্ঠুরতম ভয়াল প্রকাশ। অন্ধকার তখন আতঙ্কে পরিণত হয়েছিল।

ছবি বদলে গিয়েছিল বৈকি মাঝে। তা হঠাৎ জানোয়ারের মনুষ্যজীবে পরিণত হওয়ার কাহিনী নয়। বরং আর এক রকমের তামাসা।

জন্তুদের পেট ভরা থাকলে যেমন দু-তিনটে কুকুর, একত্রে উল্লাসে মাঝে মাঝে খেলায় মত্ত হয়, এই ব্যাপার তেমন ধারা কিছু।

পাকিস্তানী তিন চারটি জওয়ান এক বাড়ীর দরজায় কয়েকটা লাথি মেরে জোরে হাঁক দিয়ে উঠল "কেওয়াড়ি খোলো (দরজা খোলো)।"

না খুলে উপায় কী ?

সঙীন উঁচিয়ে চার জনে একদম নির্বাক প্রথমে বাড়ীর চারটি কামরা জরীপ করতে লাগল। এতক্ষণ বাড়ীর লোকজন বাতি নিভিয়ে মেঝের উপর দুরুদুরু-বুক উপুড় হয়ে শুয়েছিল। চারিদিকে গুলি গোলার আওয়াজ। আত্মরক্ষার এই পন্থা প্রায় সকলের জানা। অন্ততঃ বাড়ীর কর্তা জানতেন। তার উপদেশ কেউ সেদিন অমান্য করেনি। দামাল তিন বছরের এক শিশু বালক পর্যন্ত চুপ। সে আতঙ্কিত চোখে সিপাইদের দিকে তাকায়, পর মুহূর্তে আবার চোখ বন্ধ করে। কিন্তু কাঁদে না সে।

পরে বড় ড্রয়িং রুমে সকল-কে কাতার-বন্দী দাঁড় করানো হোলো। সব কিন্তু নিঃশব্দে ঘটছে। কোন তরুণী ছিল না এই বাড়ীতে। গৃহকর্ত্রী নিজে চল্লিশের উর্ধে বয়স। সকলকে কাতার-বন্দী করা হয়েছে বিনা হুকুমে। পাকিস্তানী জওয়ানেরাও যেন বোবা। এক-এক জন-কে বন্দুকের নলের ইশারায় এক জায়গা থেকে সরিয়ে সরিয়ে ঠিক কাতারে দাঁড় করানো হচ্ছিল। শিশু-বালক মার সঙ্গে হেঁটে এলো। তার কাছে হয়ত এ-সব কোন খেলার অঙ্গ মনে হতে পারে। তার নির্বাক, আতঙ্কিত চোখে কিছু পাঠ করা কঠিন ছিল। সবই আন্দাজের ব্যাপার।

সিপাইদের একজন হঠাৎ হুকুমের ভঙ্গীমাখা চীৎকার দিয়ে উঠল, "ব্রাশ...ফায়ার" শব্দ তখনও তার মুখ থেকে বেরোয়নি, দলের দুই মহিলা, যারা এতক্ষণ নিঃস্তব্ধ ছিল হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল, "মেরো না—মেরো না, আল্লার দোহাই।"

দুই জনের আর্তনাদে সীমাবদ্ধ ছিল না তখন। দুই হাতে সোনার চুড়ি ছিল মহিলাদের। তারা মেঝের উপর, সিপাইদের সামনে ছুঁড়ে দিল একগাছি তারপর দু'গাছি, তিন গাছি। মেঝের উপর মৃদু-মৃদু শব্দ ওঠে। চুড়ির শেষে কানের দুলে হাত দিয়েছে দুই মহিলা, তখন পুরুষালি কন্ঠ আবার শোনা গেল, "রোকো—।"

অর্থাৎ, থামো।

মহিলা দুজন তা নিশ্চয় মানেনি। তারা কানের দুল খুলে মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলছিল।

ময়দানের প্যারেড নয়, গৃহের প্যারেড। তাই গঠন বদলে গেল দু-এক

মিনিটের মধ্যে।

পেছনে অস্ত্রধারী সৈনিক। সম্মুখে মহিলা দুজন।

"বাকস কা পাশ লে চলো।" অবাঙলা এই ভাষা মহিলাদের সেই ক্ষণে বুঝতে দেরী হয়নি।

বাক্স, অবিশ্যি গহনার বাক্সের জরীপ তারপর শুরু হয়।

সৈন্যেরা একে একে পকেট বোঝাই করতে লাগল। সহজে বহনযোগ্য কাগজের নোট। দৈনিক বাজারের জন্যে এক টাকার বাণ্ডিল তিন খানা ছিল। তিন শ' টাকা। কিন্তু ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের সৈন্যদের নজর অত ছোট নয়। পকেট ক্রমশঃ বোঝাই। ছুঁচো মেরে আর হাত কে গন্ধ করে? দশ টাকা, এক শ' টাকার নোট সব পকেটে ঢুকল।

আবার ড্রয়িংরুম অকুস্থল।

আগ্নেয়াস্ত্রের নল আর কারো দিকে তাক্ করে নেই।

এক সিপাই শুধু গৃহকর্তা কে জিজ্ঞেস করলে, "তোম মুসলমান হ্যায়?"

"জী, কর্ণেল সাব,"

"ইদার কুই হিন্দু হ্যায়।"

"নেই, কর্ণেল সাব।"

সৈনিকের পদ-মর্যাদা গৃহ-স্বামীর জানার কথা নয়। তবু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। আতঙ্কে এমন সব কাণ্ড ঘটে।

গহনার আওয়াজে সেই রাত্রি একটা পরিবার বেঁচে গিয়েছিল। মহিলার মনে এমন ফন্দীর উদয় নিশ্চয় কোন বিশেষ চিন্তা-প্রসূত নয়। প্রেতায়িত আবহাওয়ায় মনের দিশা পাওয়া দায়। তবু যাই হোক, সাত আটটি প্রাণ এই ভাবে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সব সময় এমন ঘটেনি। গহনা খোয়ানোর পর প্রাণ খুইয়েছে অনেকে। জংগলে জন্তুরা ত যুক্তির ধারায় চলে না। সেখানে আদিম প্রবৃত্তির তাড়নাই যুক্তি। প্রবৃত্তির আবহাওয়া প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মত। কখন রোদ, কখন বৃষ্টি, কেউ বলতে পারে না।

কবি মেহেরুন্নেসা ছিল দরিদ্র। অলঙ্কৃত মনের অধিকারিণী হয়ে, সে ছিল নিরাভরণ। আজ মনে হয়, জন্তুদের নিবৃত্ত করার মত একটা গহনাও যদি তার থাকত।

আজ বহু বছর পেরিয়ে নানা কথা মনে আসতে পারে। বিপদ এড়িয়ে যাওয়ার নানা কথা। কিন্তু পঁচিশে মার্চের রাত্রে ক'জনই বা শান্ত-নার্ভ

শান্তচিত্ত ছিলেন ? মানুষের রাজ্যেই শুধু মানুষ থাকা যায়। আদিম অন্ধকারে আবৃত ঢাকা নগরী।

সরীসৃপ দল তাদের আদিম গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে।

আশ্রয়ের জন্যে মানুষ তাই হন্যে।

কিন্তু কোথায় যাবে সে ?

এমন বিভ্রান্তির দিনেও তাকে নিরাপদ কোন জায়গা খুঁজে বের করতে হয়। অস্তিত্ব রক্ষাই তখন মানুষের জন্যে এক মাত্র ধর্মে পরিণত। তাই গর্ত-সন্ধানী হয়ে ওঠে আদম সন্তান।

বড় রাস্তার মুখে যাদের বাড়ী ছিল তারা তখন আফশোষ করে। আলো বাতাসের জন্যে মানুষ বড় রাস্তা বড় বাড়ী খোঁজে। কিন্তু সরীসৃপ যখন মানুষের হর্তাকর্তা হয়ে ওঠে, তখন গন্তব্য বদলাতে হয়।

যাদের বাড়ীর পেছনে কোন গলি আছে এবং যে গলি আরো দূরে দূরে চলে গেছে ঘিঞ্জি পাড়ার মধ্যে, বহু পরিবার আলো বাতাসের লোভ ছেড়ে অন্ধকারের আড়ালে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর হেঁটে হেঁটে নিরাপদ দূরত্বে কোন বাড়ীর দরজায় আশ্রয়-প্রার্থনা। গুলি গোলার তান্ডব আওয়াজে অবিশ্যি কেউ নিরাপত্তা ষোল আনা ভোগ করছিল, এমন বলা যায় না। তবু আপেক্ষিকতা তখন বড় কথা। অনেকে অচেনা মানুষের পরিবারের জন্যে সেই রাত্রে দুয়ার খুলে দিয়েছে যতক্ষণ বাড়ীতে বসার জায়গা থাকে। শোয়ার আরাম ত রাজকীয় ব্যাপার। এই ভাবে এক ঘরে এক উঠানে ঠাসাঠাসি বহু মানুষ। বিপদের নিজস্ব ধারা থাকে। আর বিপদ যদি সকলের জন্যে সমান হয়, তখন মানুষ মানুষের বড় নিকটে আসে। এমন উত্তাপ সহজে মেলে না। আদিম কালে বাইরে তুমুল ঝটিকা চলাকালে গুহা-মানব যে হৃদয়-উত্তাপ ভোগ করত গোটা পরিবার বা কৌম মিলে, আজ আর তা ফিরে পাওয়া যায় না। কিন্তু তেমন উত্তাপই ত চিরকাম্য বর্তমান মানুষের যুগেও। পঁচিশে রাত্রি সমস্ত বাঙালী জাতিকে অপরূপ অনুভূতির আঁচড়ের শরীক করে তুলেছিল। স্বার্থপরতা দূর হয়ে যায় এমন ক্ষেত্রে, অন্ততঃ তার কামড় আর তেমন থাকে না। শহরের নির্দিষ্ট ঠিকানাহীন মানুষ, ভিক্ষুক, গ্রামের ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবার রাস্তার ধারে, বারান্দার নীচে, খোলা আকাশের তলায় রাত্রির বিশ্রাম উপভোগ করে। সেদিন তাদেরও কোন রেহাই ছিল না। ব্রাশ ফায়ারের মুখে বহুজন প্রাণ দিয়েছে। তারা ভাবেনি, তাদের কোন শত্রু থাকতে পারে। কিন্তু এই বঙ্গভূমে জন্মানো যে মহা অপরাধ তা তারা জানত। পাকিস্তান গোরস্থান হতে পারে তা ভাবা নিশ্চয় কঠিন ছিল তাদের পক্ষে।

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হয়। অন্ধকার সমস্ত আকাশ জুড়ে বিরাজ করে না। কতো দিকে না আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলতে থাকে। রাজারবাগ পুলিশ লাইনের বহু ব্যারাক করোগেটেড টিনের ছাউনি। সেখানে শুধু আগুন জ্বলছে না, টিন এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ার বিকট শব্দ নগরীর আশপাশ প্রকম্পিত রাখছিল। নয়াবাজারের কাঠ-গুদামের আকাশচুম্বী অগ্নিশিখা ক্রমশঃ নেমে আসে মাটির দিকে। কারণ, ইন্ধন আর নেই। কাঠ ছাই হয়ে আসছে। রাস্তাশ্রয়ী মানুষেরা এখন লাশ। আহত জনের রক্ত অনেক ক্ষণ থেকে ঝরছিল। তার দেহের উত্তাপে ইন্ধন আর কে যোগাবে ? আর্তনাদের জবাব দেওয়ার জন্যে কোন মানুষ প্রয়োজন হয় ? আহতের গোঙানি শুধু বাতাস শুনেছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে জেনারেল এহিয়ার বৈঠক। রাজনৈতিক ফয়সলা রাজনীতি মারফৎ হওয়া দরকার। তাই ঢাকা শহরে বহু বিদেশী সাংবাদিক জড়ো হয়েছিল। তারা নিজেদের হোটেলে আটক। হোটেল কন্টিনেন্টালের জানালা দিয়ে দেখছিল খান্ডব-দাহনের দৃশ্য। আরো সহযাত্রী দু'তিন জনের সঙ্গে এক বিদেশী সাংবাদিক হুইস্কির বোতল খুলে পরিবেশন-রত, অনেক ক্ষণ নেশার তলায় ডুব দিয়ে বাঁচতে তৎপর, হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠল, "হোয়াট ক্রাইম ডীড আই কমিট্ দ্যাট আই শুড বী হিয়ার—কী অপরাধ আমি করেছিলাম যে আমাকে এখানে থাকা আবশ্যক।"

শহরের নির্জন পল্লীতে একদল কুকুর আর্তনাদ করে উঠল।

মহাম্মদপুরের এক বাড়ীতে জীবিত আর কেউ ছিল না। বাক্‌স-পেঁটরা, ফার্নীচার, বিছানাপত্র সব তছনছ। দাওয়ার উপর, মেঝের উপর টাটকা রক্ত থিকথিক করছিল। বাড়ীর বিড়াল বেরিয়ে এসেছে এতক্ষণে। পাঁচ বছর বয়সের এক বালকের লাশের পাশে বসে সে মিউমিউ করছিল। আদরের লোভে কী না কে জানে। কিন্তু তার রেশম-কোমল পশমে চেনা হাত আর কোন দিন পড়বে না। প্রাণী তা কী করে জানবে ?

বিড়ালটা ম্রিয়মান গলায় বার বার মিউমিউ করতে লাগল, লাশের দিকে অপলক চোখ।

ঢাকা নগর মৃত।

এই ঘোষণা যদি সেদিন কেউ করতে পারত, তাহলে যারা জীবিত ছিল, যে যার বিশ্রামস্থল ঘরের উঠান, কামরা বারান্দা বা এই জাতীয় কোন জায়গায়—তারা জীবনের শেষ কাম্য পেয়ে গেছে, মনে করত। কারণ, জীবন্মৃত হয়ে থাকা অপেক্ষা একদম মরে যাওয়া ঢের বেশী প্রার্থিত।

কিন্তু ঢাকা শহর মরে যেতে পারে না। একটা জাতির কী মৃত্যু হয়? আহত সিংহ গুহায় গর্জন করে না সত্য, কিন্তু নিজস্ব মহিমা সে ভুলে যেতে অক্ষম।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের যোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করছে। নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছে কোথাও। এখনও নিরস্ত্র নয় তারা। আর যদি বেগতিক অস্ত্র ফেলে দিতেও হয়, অস্ত্রবিদ্যা ত সে বিশ্বাসঘাতক আততায়ীর অতর্কিত আক্রমণে ভুলে যেতে পারে না।

অন্ধকার ঘরে অনেকে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চালায় এই শহরের খাঁচা থেকে বেরিয়ে তাদের কর্তব্য কী? বাংলাদেশ শুধু এই নগরে সীমাবদ্ধ নয়, পাকিস্তানের হানাদারেরা যা মনে করে। দেশের হৃৎপিণ্ড যে কোন বিশেষ জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে না, তা তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। রাক্ষসের প্রাণ নয় দেশ যে একটা কৌটার মধ্যে তা নিবদ্ধ থাকবে।

তবু মনে হবে সব নীরব। অন্ততঃ হানাদারেরা তা-ই ভেবেছিল। তাই ক্রমশঃ গুলি গোলার আওয়াজ কমে গেল। আরো মন্দীভূত। নতুন করে আগুনও লাগে না কোথাও। অনেক জায়গায় আগুন জ্বলছে। কিন্তু অগ্নিশিখার লক্‌লকে থাবা ক্রমশঃ নীচের দিকে নরম।

মনে হবে সব নীরব।

রাস্তার ধারে যাদের বাড়ী এবং মিলিটারী গাড়ী টহল দিয়ে যাচ্ছে ঘন ঘন, তাদের শিশুদের কান্না ত ইচ্ছেমত থামানো যায় না। নিশীথিনীর স্তব্ধ পটভূমি শিশুরা ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। নতুনের আগমন এই ভাবেই হয়। তখন বর্ষীয়ানরা শুধু চুপ করে থাকে।

মনে হবে খুবই সুনসান। প্রচণ্ড নীরবতার দাপটে ঢাকা নগরী থমকে গেছে।

কিন্তু প্রহর কারো তোয়াক্কা রাখে না। কালের প্রহরী নিজের কর্তব্য সমাধান করে চলে। এক প্রহরী ঘোষণার ঘন্টাবাদক ছিল এতদিন। তারা আর শহরে নেই। তাই সময়ের পরিমাপ কঠিন। নিষ্প্রাণ ঘড়ি কিছু বলে যায়। কিন্তু বাইরে থেকে কোন এত্তেলা আসে না। কারণ, শহরে পাখী নেই। তারা প্রথম প্রহরেই শহর ছেড়ে চলে গেছে। রাত্রে কাকের

ডাক অশুভ। চিরাচরিত এই সংস্কার। পেঁচাও কালের চৌকিদার। সবাই পলাতক। কারণ, তাঁদের দায়িত্ব ফুরিয়ে গেছে এই শহরে। বাঙলাদেশের শত শত গ্রামে খবর পৌঁছানো দরকার। তারা তাই চলে গেছে।

রাস্তায় ভাঙা রিক্‌শার উপর শায়িত রিক্‌শাওয়ালা। হাতটা ঝুলে পড়েছে মাটির উপর। একটা পা হাতলের উপর ঝুলেছে। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে রিক্‌শা-চালক। রাত্রির বিশ্রাম নিতে শুয়ে ছিল, এতকাল এই শহরে যা অভ্যেস, বিশেষতঃ, গরমের দিনে।

কয়েক গজ দূরে চারটে ঠেলাগাড়ী পাশাপাশি। রাত্রে সাধারণতঃ ঠেলাগাড়ীর মালে পরিণত হয় চালক নিজে। নিজের দেহ তখন সে জমা দেয় রুজি-রোজগারের এই কাঠ-বাঁশে তৈরী মাচাঙের উপর। আজ যেন ব্যতিক্রম। না, শুধু জায়গা বদলে গেছে। চারজন ঠেলাগাড়ীর চালক মুখ থুবড়ে নীচে পড়ে আছে জড়াজড়ি করে। দু'টো ঠেলাগাড়ীর চাকা ভেঙ্গে পড়ে আছে চূর্ণ-বিচূর্ণ লাশের উপর। মনিবের উপর মায়া তামিল-বাহী ভৃত্য কী ভাবে পরিত্যাগ করবে ?

দেওয়ালে দেওয়ালে অসংখ্য দাগ।

বাঙলা একাডেমীর পূর্বদিকে দোতলার দেওয়ালে মর্টার শেল এক বিরাট গোল খোন্দল তৈরী করেছে ভেতরে সেঁধোতে। এখানে ত কোন মানুষ ছিল না। ইমারতের উপর এত চোটপাট কেন ? ইট, পাথরের উপর আক্রোশ ঝাড়ে মূর্খ এবং বর্বর। না, ওরা মূর্খ নয়, যদিও বর্বর। বাঙালী জাতীয়তাবাদের এই এক ইনষ্টিট্যুশান—এক মহান প্রতিষ্ঠান এখানে জাতির আত্মমর্যাদার উপাদান তৈরী হয়। বর্বরেরা তা জানত। অতএব, ভাঙো। আর মানুষ সংহার করো।

নিকটে শহীদ মিনার একই লজিকে আক্রোশের অবলম্বন হয়ে ওঠে। কিন্তু বর্বরেরা জানে না, মানুষ ত শুধু মানুষ নয়। সে তার আত্মার প্রতিধ্বনি। উৎস থেকে বেরিয়ে গেলে ধ্বনি নিজেই স্বাধীন শব্দে পরিণত হয়। মানুষ মরলেও প্রতিধ্বনি মরে না। সালাম, বরকত-কে কেউ কী হত্যা করতে পেরেছে ? কিন্তু বর্বরদের কাছে মুহূর্তই সত্য। তাদের কার্যাবলীর আয়ু ভবিষ্যত পর্যন্ত গড়ায় না। ওদের আক্কেলে তা সেঁধোনোর কোন পথ নেই।

ইমাম টিক্কা খানের মুরীদেরা মুসকিলে পড়েছিল পুরাতন এয়ার পোর্টের কাছে।

হঠাৎ কোথা থেকে চার পাঁচটা গরু বেরিয়ে এসেছিল। সবাই চোঁ-চা জোর দৌড় মারছে। গরুগুলো নিয়ে কী করা যায়? ধরতে পারলে মেরে একটা মোচ্ছব হোতে পারে। কিন্তু জ্যান্ত ধরা দায়। কোন দিকে তাড়িয়ে কোনঠাসা করতে পারলে একটা ব্যবস্থা হতে পারে। তা-ও ফ্যাসাদ। দড়ী দরকার। কিন্তু আতঙ্কিত গরুগুলো যেভাবে দৌড়ায়, কাছে যাওয়া ত বিপদ। একটা উপায় আছে। পায়ে গুলি করে ফেলে দিয়ে পরে ট্রাকে করে তুলে নিয়ে গেলে চল্‌বে। কিন্তু পায়ে গুলি ত নিশান-মত হওয়া হয়। পেটে লাগলে ত মরে যাবে। হারাম হয়ে যাবে গোস্ত। তাহলে সব মেহনত বরবাদ। জবাই করাও ত এক হাংগামা।

সাঁজোয়া গাড়ীর উপর থেকে দু'জন জওয়ান নেমে পড়ে হে-ই হে-ই করতে লাগল। পাকিস্তানী সৈন্য রাখাল ব'নে গেছে। ইজ্জতে লাগার কথা। এমন তাগড়া বয়েল (গরু) এই ভুখা-নাংগা পূর্বপাকিস্তানে কম দেখা যায়। কিন্তু মানুষ ধরা ত সহজ। তার ব্যবস্থা করছে তারা রাত দশটা থেকে। সেখানে ধরতে হয় না। হাতিয়ার চালালে শত খণ্ডে পরিণত শিকার। কিন্তু এই শিকার নিয়ে ফ্যাসাদ। এগুলো আস্ত রাখতে হবে।

শলা পরামর্শ চলছিল। যখন সাঁজোয়া গাড়ী থামে, গরুগুলো যেন টের পায়, থেমে যায়। কিন্তু গাড়ী চললেই তাদের দৌড়ের গতি আর থামে না। ধরতে পারলে ব্যারাকে গোস্ত খাওয়া যেত ক'দিন পেট ভরে। পূর্বপাকিস্তানের গরুগুলো নেহাৎ গরু। আইন-কানুন জানে না, সিপাইদের মানে না।

গরু বনাম হানাদার অর্থাৎ টিক্কা খানের লেলানো কুকুর। আক্কেলের লড়াই চলল কিছুক্ষণ জানোয়ার বনাম জওয়ান। রাস্তায় কোন মানুষ নেই। মাশরেকী (পূর্ব) পাকিস্তান এক জায়গা বটে! ওরা যে মুসলমান নয়, আধা-মুসলমান তা ওদের গরুর আচরণে বুঝা যায়, আদব-কায়দা জানে না।

তিনটে গরু এক গলির ভেতর দিকে ছুটে পালাল। গুলি করল না কোন জওয়ান। আরো দু'টো বাকী। সহজে বাগে আনা হয়ত সহজ হবে। কিন্তু ওদের ধারণা অমূলক। পোষা গরু যখন বুনো স্বভাব পায়, তার চাল চলন ধরতে পারা কঠিন।

সাঁজোয়া গাড়ী চলছে, গরু দৌড়াচ্ছে যথারীতি।

শেষে ফয়সালা হয়ে গেল।

হঠাৎ ইমামের কথা ওদের বোধ হয় মনে পড়েছিল। টিক্কা খাঁ বলেছে "হাম জমিন দেখনে মাংতা আদমী নেহি। (আমি জমিন দেখতে চাই, মানুষ না)।"

গরুগুলো ত মানুষ নয়। কিন্তু পনর-বিশ মিনিট যে খেল্ দেখালে তা দেখে ত মনে হয় এগুলো মানুষ ছাড়া আর কি? এমনই চিন্তা জেগেছিল বৈকি ওদের মনে।

তবে এক জওয়ানের লজিক সব ছাপিয়ে গেল। সে বললে যে গরুগুলো চমৎকার গাই। নিশ্চয় ভাল দুধ দেয়। এই দুধ খেয়ে-খেয়ে বাঙালীদের হিম্মত বেড়েছে। আস্পর্দ্ধা বেড়েছে। অন্য গরুগুলো যেতে দেওয়া উচিত হয়নি। তাছাড়া গরু আর মানুষ এদেশে কোন তফাৎ নেই।

মোক্ষম যুক্তি !

স্ট্রাটেজি ঠিক হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে গরু দু'টো ছিন্ন-ভিন্ন আঁৎড়ী, পথের উপর লুটিয়ে পড়তে পড়তে শেষ হাম্বাম্বরে চীৎকার দিয়ে উঠল।

রাত্রি এগিয়ে যায়।

কালের মতই হানাদারেরা চঞ্চল। তাদের গতিবিধি বাতাসও লিখে রাখে।

সেই রাত্রে বিভিন্ন এলাকার সৈন্যদলের পরস্পরের মধ্যে যে বাক-বিনিময় হয়েছিল, তা থেকে আন্দাজ করা যায় তাদের জিঘাংসার রূপ। বেতারের বায়ু-পট মিথ্যে কোন শব্দ যোজনা করে না। সংকেত-বাণীর মর্মোদ্ধার আজ জানা হয়ে গেছে।

মিলিটারী কন্ট্রোল-কক্ষ থেকে নির্দেশ-আদেশের ফরমান, জবাব ভেসে যায় ঢাকা-নগরীর এক এলাকা থেকে আর এক এলাকায়। সংখ্যাগুলো বিভিন্ন মিলিটারী ইউনিটের।

কন্ট্রোল। হ্যালো নাইনটিনাইন...... লাইনে থাকো...... কোন খবর নেই। ইউনিভার্সিটি এলাকায় এখনও যুদ্ধ চলছে। ওভার।

সাতাত্তর। অষ্টআশির কাছ থেকে শেষ খবর...বেশ এগিয়ে যাচ্ছে সামনে অনেক ঘরবাড়ী একটার পর একটা মিশ্‌মার করতে হচ্ছে। ওভার।

কন্ট্রোল। সাতাত্তর—তাকে বলো যে বড় ভাইয়েরা জলদি তার কাছে যাবে। তখন বাড়ীগুলো ধূলিসাৎ করার জন্যে কাজে লাগাতে

পারবে। এবারে অন্য দিকে মনে হচ্ছে লিয়াকত ও ইকবাল ঠান্ডা হয়ে গেছে। ঠিক বলছি ত ? ওভার।

এখানে বড় ভাই মানে আর্টিলারী বাহিনী। গোলন্দাজ বাহিনী। লিয়াকত ও ইকবাল অর্থ দু'টি হ'ল।

সাতাত্তর। কাজ শেষ করার সংবাদ এখনও মেলেনি। তবে ও-দুটোর মোকাবিলায় ওরা খুব খুশী। ওভার।

কন্ট্রোল। খুব খুশীর খবর। ওভার।

……

কন্ট্রোল। (অষ্টআশির প্রতি) ইমাম এখন ছাব্বিশ নম্বরের সঙ্গে। যদি তোমাদের আর কোন সাহায্য লাগে তাহলে ওকে তোমরা জানাতে পারো।

বক্সারদের সম্পর্কে বলছি। ওরা রওয়ানা হয়ে গেছে। সকাল হওয়ার পূর্বেই সামনে যা বাধা চুরমার করার কাজে জলদি তোমাদের মদৎ দিতে পারবে। ওভার···

এখানে বক্সার মানে মুষ্টিযোদ্ধা নয়। মিলিটারীরা বাড়ী-ঘর-দোর ধূলিস্মাৎ করার ইউনিটের কোড-নাম দিয়েছিল বক্সার।

প্রতিটি ছাত্রাবাসের দিকে মিলিটারীদের নজর ছিল কড়া। কারণ পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। লিয়াকত বা ইকবাল নয় শুধু জগন্নাথ হলের উপর দিয়ে মৃত্যু-তাণ্ডব নেচে যায় আরো প্রচণ্ড নৃশংসতা-সহ। পয়লা চোট সামনে যারা সম্মুখে পড়েছে তারাই গুলির নির্মম আঘাতে লুটিয়ে পড়েছে। এক পর্যায়ে মিলিটারীদের সিদ্ধান্ত একটু সরে যায়।

বেতারের পটে ধরা পড়ে কয়েকটি কথা। সেখানে সাতাত্তর থেকে ছাব্বিশ নম্বর ইউনিটকে-কে বলছে : “মারঘোরে জানিয়েছে যে, ইমামের নির্দেশ, সকাল হওয়ার পূর্বেই সব লাশ সরিয়ে ফেলতে হবে। একথা সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয় যেন। ওভার।”

মারঘোরে অর্থাৎ এ্যাডজুট্যান্ট। হানাদার বাহিনী জগন্নাথ হলে এক পর্যায়ে হত্যা থামিয়ে দেয়, বোধ হয়, পূর্বোক্ত নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে। লাশ ত একটা দু'টো নয় শত শত। এগুলো মাটীর তলায় পুঁতে ফেলতেও ত এক জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। কেউ জীবিত না থাকলে, লাশ বইবে কে ?

কালরাত্রির অন্ধকার সাঁতরে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল জগন্নাথ হলের ছাত্র কালীরঞ্জন শীল। তার এই পুনর্জন্মের কাহিনী, মৃত্যুর মুখোমুখি-ফেরৎ কালীরঞ্জনের মুখ-জবানি শুনুন। “……দু-তিনজন করে আমরা একটা লাশ বহন করছিলাম। কোন জায়গায় বসলে বা

হাঁটলে মিলিটারী গুলি করার জন্যে তেড়ে আসছিল। ……কতো লাশ যে বহন করেছি ঠিক মনে নেই। ……আমাদের আগে যারা লাশ নিয়ে পৌঁছেছিল তাদের দাঁড় করিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন খুব জোরে জোরে কোরানের আয়াত পড়ছিল। ছেলেটি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। কিশোরগঞ্জ বাড়ী। আগের দিন বিকেলে এক বন্ধুসহ এসে উঠেছিল তার হলের এক হিন্দু বন্ধুর রুমে। গুলি করল তাদের সবাইকে। … আমরা কোন রকমে দু'জনে লাশটা টানতে টানতে এনেছি। … … … সামনে ডাঃ গোবিন্দ দেবের মৃত দেহ। ধুতি পরা, খালি গা। আমার সাথে যে ছেলেটি লাশ টানছিল সে গোবিন্দ দেবের লাশটি দেখে বলল, 'দেব-কেও মেরেছে। তবে আমাদের আর মরতে ভয় কী?' কি ভাবে আমি দেবের লাশের পশ্চিম পাশ ঘেঁষে সুনীলের লাশ-সহ শুয়ে পড়লাম বলতে পারব না।''

সুনীল ছিলেন জগন্নাথ হলের দরওয়ান। মৃতজনের ভিড়ে লাশ-রূপে পরিত্যক্ত কালীর পুনর্জীবন-প্রাপ্তির মত এমন আরো দু-এক জন দৈবক্রমে সেদিন রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল বৈকি।

বেতারের এক পট-থেকে সেই রাত্রে অন্যান্য পটে শব্দচিত্র ফুটে ওঠে।

কন্ট্রোল। হ্যালো, একচল্লিশ…ষোলো…অষ্টআশি তোমরা খবর পেয়েছ? ওভার। হ্যালো অষ্টআশি—একচল্লিশ যে খবর পড়ে দিল তা কী পেয়েছে?

……… ……… ……… ……… ……… ……… ………

অষ্টআশির প্রতি। হ্যাঁ, সেগুলো সরাবার ব্যবস্থা করেছি। তুমি স্থানীয় 'লেবার' ব্যবহার করে সেগুলো সদর জায়গা থেকে সরিয়ে ফেল। ওভার।

… … … … … … … … … … … … … …

একচল্লিশের প্রতি। … … … যে-সব মহিলাদের তুমি জানো তাদের কাছে যেতে পারো। আর যে-সব সিরিয়াস লোকদের আমাদের দরকার তাদের একটা লিষ্টি বানাও … …ওভার।

অষ্টআশির প্রতি। ভালই করেছ। ইউনিভার্সিটিতে যারা নিহত হয়েছে তাদের আনুমানিক সংখ্যা কত হতে পারে, তোমার মনে হয়? তোমার আন্দাজ-মত যা হয় তা-ই বলো। নিহত বা জখম কি ধৃত লোকের সংখ্যা

কত ? একটা মোটামুটি হিসেব দাও। ওভার।

অষ্টআশি থেকে। অপেক্ষা করুন। প্রায় তিনশ। ওভার।

অষ্টআশির প্রতি। বেশ করেছ। তিন শ’ নিহত ? কেউ কী জখম হয়েছে বা ধরা পড়েছে ? ওভার।

অষ্টআশি থেকে। আমি কেবল একটা জিনিষেই বিশ্বাস রাখি—তিন শ’ নিহত। ওভার।

অষ্টআশির প্রতি। হ্যাঁ, আমিও তোমার সঙ্গে একমত, ওটাই সহজ কাজ ··· না কিছু জিজ্ঞেস করা হচ্ছে না। তোমার কোন কিছু আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। আমি আবার বলছি, বহুৎ আচ্ছা কাম কিয়া। এই এলাকায় এমন তোফা কাজ করার জন্যে তোমার জওয়ান এবং প্রিয় সঙ্গীদের বহুৎ মোবারকবাদ। আমি বহুৎ খুশী। ওভার।

উপরোক্ত ‘থেকে’ এবং ‘প্রতি’ শব্দ দু’টি লক্ষণীয়। হানাদার সৈন্যদের বাক-বিনিময় থেকে অনুমান করা যায়, বর্বরতার কোন পর্যায়ে পৌঁছলে নরঘাতকেরা অমন খোশালাপ চালাতে পারে।

কতো রাত্রি তখন ?

এই প্রশ্নের জবাব ঢাকা নগরীর বেসামরিক অধিবাসী সেদিন জবাব দিতে পারত না। শুধু শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগপন্থী হ’লে একজন অপরাধী হবে শাসকদের আইনের চোখে—তা ত নয়। বাঙালী মাত্রেই সেদিন অপরাধী। নচেৎ পাইকারী গণ-হত্যা সভ্যতার আর কোন মাপকাঠি দিয়ে শুরু হতে পারে ?

সকল পরিজন-সহ মধু তার কোয়ার্টারে সেই রাত্রে পরম করুণাময়কে মনে মনে ডাকছিল বৈকি। হিন্দু পরিবারে জন্ম। তা মধুর সামাজিক পরিচয়। কিন্তু আন্তরিক পরিচয়ে মধু ত বাঙালী—বাঙলা-জননীর সন্তান। তাই নিজের ভেতর থেকেও তার কাছে অন্য ধর্মাবলম্বীরা কেউ অনাত্মীয় নয়। মধুর ক্যান্টিন ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চা-খানা নয়—একটি ইনস্টিট্যুশান। নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে বিক্রমপুর পরগনা-আগত শ্রীপুর গ্রামের শ্রী মধু দে গড়ে তুলেছিল তৃষ্ণাহর এই পানশালার ঐতিহ্য। ধর্মের আল্‌খেল্লা তার কাছে মনুষ্যত্বের কোন নিদর্শন নয়।

ক্যান্টিন বন্ধ করে সকাল-সকাল বাড়ী ফিরেছিল মধু দে—অগণন

ছাত্রের সে ত মধুদা—মধু দাদা। অগ্রজের স্নেহও অঢেল। শূন্য-পকেট কতো জন নির্দ্ধিধায় এখানে খেয়ে গেছে। বেরুনোর সময় শুধু সামান্য উচ্চারণ, "মধু দা, মা-লক্ষী—।" অনেককে তা-ও সম্পূর্ণ উচ্চারণ করতে হোত না। শুধু পকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে নিঃশব্দ ইংগিতে বাকীটুকু সম্পন্ন করত। হৃষ্টপুষ্ট কি, নধরকান্তি কৃষ্ণরং মধু দে রাশভারী গাম্ভীর্যের তলায় নিশ্চয় স্নেহের উৎপাত বইবার মত শান্ত সামুদ্রিক প্রশান্তি অর্জন করেছিল। তার জনপ্রিয়তা সস্তা সামাজিকতা কিছু নয়।

দোতলা কোয়ার্টারে ওদের গোটা পরিবার এক কামরায় জড়ো হয়েছিল। বাইরে হিংস্রতার তাণ্ডব, গুলিগোলার গর্জনে শঙ্কিত সকলে। দোতলায় উঠে এসে হামলা চালানোর সুযোগ কম, যদি মিলিটারী গোয়েন্দা বিভাগের লোক আগে থেকে কোন লোক বা বাড়ী চিহ্নিত করে না রাখে।

পাকিস্তানী হানাদারদের নিকট মধু কোন সাধারণ চা-খানার মালিক নয়। তার নাম সংস্কৃত। অর্থাৎ হিন্দু সে। অতএব, অন্য অপরাধ ত গুণে দেখার দরকার নেই। কিন্তু মধু দে'র কোয়ার্টার কেউ চেনে না। অন্ততঃ পাক-মিলিটারী শয়তানদের নিকট সে অজ্ঞাত ছিল।

গোটা পরিবার এক জায়গায় দুরুদুরু বুকে উৎকন্ঠিত মুহূর্তের মোকাবিলা-রত। মা ষষ্ঠির কৃপায় মধু দা'র পরিবার ত পরিবার নয়—বরং এক বাহিনী। পাঁচ ছেলে, ছয় মেয়ে। এ-ই ত এগারো জন। গৃহিনী যোগমায়া দেবী শুদ্ধ এক ডজনের বেশী হয়ে যায়। মেয়েদের নামও মধু রেখেছিল স্বরে-আকারের প্রতি আকর্ষণেঃ মলিনা, সুষমা, প্রতিভা, দুর্গা। রাণু, টুলি—আবার ডাক নামে ইকার ও উ-কারের আকর্ষণ। রঞ্জিৎ, অরুণ, অধীর, বাবুল, সব চেয়ে ছোট পিংকু, ভাল নাম অশোক দে—এই পাঁচ পুত্র। রঞ্জিতের শুধু বিয়ে হয়েছিল চার মাস পূর্বে। স্ত্রী বীণারাণী দে।

মিলিটারী খাতায় নাম থাকলেও মধু দে সেই রাত্রি হয়ত রক্ষা পেয়ে যেতে পারত। কিন্তু তা হওয়ার নয়। ইতিহাসের আর এক বিধি সেদিন পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন ধর্মের চেয়েও আইডেন্টিটির আরো শক্ত বন্ধন থাকতে পারে। ধর্মই একমাত্র জুড়ে থাকার সিমেন্ট নয়।

মধুর বাসা মিলিটারীদের জানা ছিল না।

বিহার-আগত হরিপ্রসাদের নামও মধু অপেক্ষা ঘোর সংস্কৃত। কিন্তু হরিপ্রসাদ উর্দু হিন্দী কথাবার্তায় ত মিলিটারীদের আত্মীয়। ভাষার দৌলতে হরিপ্রসাদ বেঁচে গিয়েছিল। তা-কে হানাদারেরা হত্যা করেনি। সে অবিশ্যি হিন্দু। কিন্তু তা-তে কিছু আসে যায়নি। ধর্ম ও জাতীয়তা

এক দ্রব্য নয়।

হরিপ্রসাদের ত কিছু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। সেই মিলিটারীদের ডেকে এনেছিল মধুর আস্তানা দেখিয়ে দিতে। হরিপ্রসাদ পেশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মালী।

কয়েক মিনিট নয়, চোখের পলকে একটি কামরার ভেতর রক্তাক্ত নাটকের দৃশ্য অভিনীত হয়ে গেল। তাকের প্রয়োজন ছিল না, বুঝা যায়, নিহত-আহতদের দেহের সংস্থান থেকে। মধু এবং সহধর্মিনী যোগমায়া উভয়ে গুরুতর রূপে আহত, রক্তক্ষরণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বড় ছেলে রঞ্জিৎ কুমার এবং প্রায় সদ্য বিবাহিত বধূ বীণারাণী কিছুক্ষণ পরে মারা যায়। ছোট-ছোট বাচ্চাদের দিকে তাক করে গুলি না ছুঁড়লেও তারা অক্ষত থাকেনি। রাণুর বয়স তখন আট, গলায়-বুকে গুলি লেগেছিল। রানুর ভাল নাম প্রতিমা। পরিবারের বড় চার জন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। রয়ে গেল অবোধ বালক-বালিকা ক'জন। মেয়ে টুলির বয়স মাত্র দেড় বছর। মধুর বড় মেয়ে মলিনার বিয়ে হয়েছিল শাঁখারি বাজারে। সে শ্বশুর বাড়ীতে ছিল সেই রাত্রে। মানুষের সংসার ছারখার হয়ে যায়। মধুর পরিবার নিমেষে তার উদাহরণে পরিণত হয়। রক্তের দোল-উৎসবে নিহত আহতদের সহ-অবস্থান ঘটে।

দু'হাজার নম্বর এলাকা তখনও জ্বলছিল। রাজার বাগ পুলিশ লাইনে মিলিটারীদের সংকেতে তখন ওই নাম ধারণ করে। সারারাত প্রায় সেখানে আগুন নেভেনি। দাউদাউ না হলেও কোথাও না কোথাও আগুনের শিখা সজীব ছিল। জাহান্নামে তা-ই ঘটে।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার জাহান্নামে অত আগুন ছিল না। কিন্তু দহনের প্রবাহ ত অনন্ত। আহত জনের গোঙানি, মুমূর্ষ জনের নিস্তেজ কাৎরানি ত আরেক রকম দোজখের ছবি। মানুষের বুকে সেই অনল-কুণ্ড জ্বলতেই থাকে, সহজে নেভা জানে না। আর এক-একটী মানুষের সঙ্গে যে আরো বহু জন জড়িত, সামাজিক কাঠামোর ধর্মে তারাও কী নরকের আঁচ ভোগ করে না ?

সভ্যতার কবর দিচ্ছিল হানাদারদের দল রাত্রির শেষ পর্যায়ে। ভোরের দিকে আকাশ ক্রমশঃ অন্ধকার হটিয়ে দেয়। আলোর ঝিলিক ছুঁয়ে যায় বসুন্ধরার নানা চত্বর। অন্ধকার দুর্জনদের ঢেকে রাখে; ঢেকে রাখে তাদের পাপ। আলো নরাধমগণের জন্যে ভীতির ব্যাপার। নিহত ছাত্র-শিক্ষকদের লাশ চাপা দেওয়ার তাই আয়োজন চলে।

ক্রমশঃ আকাশ পরিষ্কার হয়।

ব্রাহ্মমুহূর্ত। সুবে সাদেক।

ইমাম সাহেব ঘুমোননি সারারাত। এই ইমাম ছদ্মনামা টিক্কা খান নয়। ইনি সত্যি মসজিদের ইমাম।

শহর মানে যুদ্ধক্ষেত্র। অস্ত্র গুলিগোলা, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি তা-ই স্বাভাবিক ব্যাপার। কারফিউ আছে, তা-ও সত্যি। ইমাম সাহেব ধন্দে পড়লেন। বছরের পর বছর তিনি আল্লার ঘর থেকে মুসল্লীদের ডাক দেন ফজরের নামাজে সামিল হ'তে। তার পেশার নিজস্ব ধর্ম আছে। দায়িত্ব-পালন সেখানে 'ফরজে'র মত। যেন স্রষ্টারই আদেশ। ইমাম সাহেব তা-ই ধন্দে পড়লেন। কারফিউ মানলে ফজরের নামাজে আহ্বানের যে-দায়িত্ব, তা পালিত হয় না। অর্থাৎ বাদ্‌শার কথা মানলে আল্লার প্রতি অবমাননা দেখানো হয়। আল্লার কথা মানলে বাদ্‌শা না-খোশ থাকেন।

এই সংকটের সমাধান তিনি নিজেই করলেন।

গলি থেকে ত বেশী দূরে নয়। নিকটেই মসজিদ। পাঁচ সাত মিনিটের পথ। মিলিটারী টহল সব সময় থাকে না। অনেকক্ষণ তিনি লক্ষ্য করেছেন। বিশ-মিনিট আধ-ঘন্টা বাদ-বাদ মিলিটারী জীপের বহর দৌড়ে যায়। গলি পার হতে বেশী সময় লাগবে না। একটু জোর হাঁটলে পাঁচ মিনিটেই মসজিদে তিনি পৌঁছে যাবেন।

ইমাম সাহেব আর দেরী করেন না। আল্লাকে ইয়াদ করে পথে পা বাড়ালেন। জোর কদম হাঁটছেন তিনি। আকাশ পরিষ্কার। না মিলিটারী টহল এখন নেই। দ্রুত পা চালিয়ে তিনি মসজিদের পৈঠায় পা রেখেছেন, হঠাৎ ষ্টেনগানের শ্‌...শ্‌...গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

ইমাম সাহেবের ঝাঁঝরা দেহ মসজিদের পৈঠা থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে গেল।

ভোরের আজান দেওয়ার আর প্রশ্ন ওঠে না।

ক্যান্টিনে মধু দে আর কোনদিন আসবেন না।

পরিষ্কার আকাশ ছিঁড়ে রক্তিম সূর্য উঠছিল। নতুন সকাল।

মধুদা'র স্ত্রী যোগমায়া দেবী অন্তঃস্বত্তা ছিলেন। আহত অবস্থায় তিনি নব-জাতকের জননী। রক্তের সমুদ্রে তারা সাঁতার কাটছিল।

কালরাত্রি কী একদিনেই শেষ হয় ?

না।

দিনের জের আরো জের সৃষ্টি করে।

কুরুক্ষেত্রে একটি রাত্রি শেষ হয় মাত্র।